সম্পাদকীয়

নববর্ষের আশার বাণী যেন অসার না হয়

সময়ের স্রোতে ভেসে নতুন নতুন বছর আমাদের সামনে আসে, আবার সময়ের স্রোতে ভেসে চলেও যায়। প্রতিটি নতুন বছরের আগমন আমাদেরকে নতুন আশা দেয়, স্বপ্ন দেয়। আমরা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করি, পুরাতন জীর্ণতাকে ছুড়ে ফেলে নতুন করে জীবনটাকে সাজানোর অঙ্গীকারে নিজেদেরকে বন্দী করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে এসে ভার্চুয়াল শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও নিত্যনতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

কিন্তু এত শুভকামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ও যেন সময়ের স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে। সমাজে শুভবোধের উদয় হচ্ছে না, সুদিন আসছে না, গ্লানি মুছে যাচ্ছে না, জ্বরাও কাটছে না। প্রতিদিনের পত্রিকার পাতাগুলো দুঃসংবাদে ভারি হয়ে থাকছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের নৃশংসতা, জঘন্যতা। চারিদিকে মানুষের পশুত্বের জয়ডঙ্কা বাজছে। এই পাশবিক হুঙ্কারের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল বা মৌখিক নববর্ষের শুভেচ্ছা কেবলই পরিহাস ছড়াচ্ছে। সুদিন আনতে হলে প্রয়োজন পড়ে একটি উন্নত আদর্শের, প্রয়োজন পড়ে কিছু মানুষের প্রাণান্তকর সংগ্রামের এবং সীমাহীন ত্যাগের।

সেই আদর্শ আমরা কোথায় পাবো? সমাজতন্ত্র তো বহু আগেই মরে ভূত, সাম্যবাদীরা খোলস পাল্টে এখন ঘোর পুঁজিবাদী। জীবনব্যবস্থা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলো আবেদন হারিয়ে ফেলেছে বহু শতাব্দী আগেই। সেগুলো এখন একটি শ্রেণির জীবিকা, বাণিজ্য আর উপাসকদের সওয়াব কামাইয়ের মাধ্যম মাত্র। এখন গণতন্ত্রও কেতাবি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে কালোটাকার মালিকদের ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে। মানুষ হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাদের সামনে কেবল একটাই পথ, ধ্বংসের প্রহর গোনা। কোনো দুঃসংবাদই এখন আর মানুষের মনে বেদনাবোধ জাগাতে পারছে না, গুটিকয় মানুষের প্রতিবাদের ভাষাও পর্যবসিত হয়েছে গতানুগতিক, বাগাড়ম্বর, আত্মপ্রচার আর প্রদর্শনেচ্ছায়।

বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে পাশ্চাত্যের পারমাণবিক দানবেরা। তারা মুহুর্মুহু হুমকি দিয়ে যাচ্ছে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের, নতুন নতুন দেশকে অবরোধ আর আগ্রাসনের। ধ্বংস হয়ে গেছে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে ইয়েমেন, আফ্রিকা, পুড়ছে রাখাইন। কিন্তু কিছুতেই যেন জাগছে না মানুষ। তাদের চেতনা নেই, তারা ব্যস্ত নিজেদের জীবন নিয়ে, নিজেদের আনন্দ-বিনোদন নিয়ে, জ্ঞান ও ধনের বড়াই নিয়ে, তারা ছুটছে স্বার্থচিন্তা আর উচ্চাশা নিয়ে। তাদের বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, ভোগ চাই। তাদের সীমিত আয়ুকে যত বেশি উপাচার উপকরণে সাজানো যায় ততই তারা নিজেদের জীবনকে স্বার্থক মনে করেন। এখানে ন্যায় অন্যায়ের কোনো বাছবিচার নেই, কার কী ক্ষতি হলো সেদিকে নজর নেই, কোনো নীতি আদর্শ নেই, ত্যাগের মহিমা কী সেটা তারা জানেও না। শুধু আরাম আয়েশ চাই, বিত্তবৈভব চাই। এই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ভেসে যাচ্ছে মানবজাতি, ভেসে যাচ্ছে বছর-দশক-শতক। নতুন দিন আরো খারাপের বার্তা নিয়েই আসছে। ঘণ্টা বাজছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। জঙ্গিবাদ ইস্যুতে রক্তাক্ত সবুজ এই গ্রহ। চূড়ান্ত ধ্বংসের আগেই মানুষ ঘুরে দাঁড়াবে কি? একটু ভাববে কি? একটু স্বার্থচিন্তায় বিরতি দেবে কি? একটু বসবে কি নিজের সামনে?

আজ তাদের সামনে ধ্বংসের বার্তা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি মুক্তির মন্ত্রও মন্দ্রিত হচ্ছে মৃদুস্বরে। সেই স্বর হেযবুত তওহীদের। অনাদৃত অপরিচিত এক চিকিৎসক যেন কড়া নাড়ছে মৃত্যুপথযাত্রীর দুয়ারে। তার কাছে আছে সেই মহৌষধ যার দ্বারা আরোগ্য মিলবে এই মরণাপন্ন পৃথিবীর, গোটা মানবজাতির। কী সেই ঔষধ, কে সেই চিকিৎসক? জানতে হলে দৈনিক বজ্রশক্তি পড়ুন। কবিকণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে তাই বলছি যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। সেই অমূল্য রতন পাবেন আমাদের পত্রিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোর মধ্যে।

সূচিপত্র

- *কিংডম অব হ্যাভেন* ২
- *প্রসঙ্গ: জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা* ৭
- *কে মুসলমানদেরকে অসার তর্ক-বাহাসে লিপ্ত করলো?*.....৮
- *প্রসঙ্গ: সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মসজিদের মাইক ব্যবহার*.....১০
- *এখন কী করবে মুসলমানেরা?* ১১
- *প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র চিঠির জবাবে কাজী নজরুল ইসলাম*.....১৬
- *ধর্মনেতারাই যখন ধর্মের প্রতিবন্ধকতা*.....১৭
- *দ্বিধাগ্রস্ত ও শতধাবিভক্ত সমাজ প্রগতির অন্তরায়*.....১৯
- *একটি স্বার্থপরতার গল্প*.....২০
- *সুদের চোরাবালি* ২১
- *কেতাব বহনকারী গর্দভ* ২৩
- *দুর্বলতম মানুষটির জন্যও যিনি বিচলিত হন!* ২৫
- *মাহফিলের উপজীব্য যখন অপপ্রচার*.....২৭
- *শিল্পচর্চা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ধর্ম*...২৮
- *কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে ইসলামের আদর্শ*.....৩০
- *একটিমাত্র ফেরকা বাদে সমস্ত ফেরকা-মাযহাব আগুনে*.....৩২

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ **ওয়েব:** www.bajroshakti.com **ই-মেইল:** bajroshakti@gmail.com

কিংডম অব হ্যাভেন

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

আজ দুনিয়াময় প্রায় দুইশ' দশ কোটির উপরে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী রয়েছেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক এই দু'টি মতের অনুসারী। এর বাইরেও ছোটখাটো আরও অনেক ধর্মীয় শাখা বা দল আছে। ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যত বিভক্তিই থাকুক, তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে যিশু খ্রিস্টের অর্থাৎ ঈসা মসীহ (আ.) এর অনুসারী বলে দাবি করেন। আজ আমরা খ্রিস্টধর্ম ও ঈসা (আ.) প্রসঙ্গে কিছু মহাসত্য তুলে ধরছি।

একজন গোত্রীয় নবীর গোত্রীয় জীবনব্যবস্থাঃ

ঈসা (আ.) মূলত ইহুদি জাতির নবী ছিলেন। বনী ইসরাইলের মধ্যেই তাঁর দায়িত্ব ছিল সীমিত। ঈসা (আ.) যেটা তার জাতিকে বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি শুধুমাত্র বনী ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলিকে উদ্ধার করতে (ম্যাথু ১৫: ২৪)। তাঁর প্রধান বারো জন শিষ্যকে তিনি যখন প্রচার কাজে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়েছিলেন তখন তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন- "তোমরা অন্য জাতিগুলির মধ্যে যেওনা এবং কোন সামারিয়ান শহর নগরে প্রবেশ করো না। শুধু মাত্র ইসরাইলী বংশের পথভ্রষ্ট মেষগুলির কাছে যেতে থাকবে (Matt 10:6)। সুতরাং যারা নিজেদেরকে ঈসা (আ.) এর অনুসারী দাবি করেন তাদের পক্ষে ইহুদি জাতির বাইরে অন্য জাতির লোকের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করা, তাদেরকে ঈসার (আ.) অনুসারী বানানো নিষিদ্ধ এবং অসম্ভব কর্ম। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ, ইহুদিদের ওপর নাজেলকৃত জীবনব্যবস্থা বিশ্বজনীন (Universal) ছিল না, সেটি শুধু বনী ইসরাঈলের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। কাজেই বনী ইসরাইলের বাইরে যারাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাদের যে বংশধরেরা নিজেদেরকে জেসাসের অনুসারী দাবি করেন, তাদের এই দাবি অবান্তর। ঈসা (আ.) নিজে কোনদিন খ্রিস্টধর্মের নামও শোনেন নি। তিনি প্রায়শ্চিত্তবাদ, সন্ন্যাসবাদ, ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরের পুত্রত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বাস্তবে এই ধারণাগুলোই কালক্রমে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিরূপে দাঁড়িয়ে গেছে।

একত্ববাদঃ

ঈসা (আ.) আজীবন এক আল্লাহর কথাই প্রচার করেছেন। তার বিশিষ্ট শিষ্যগণও জীবনভর এক আল্লাহর দিকেই মানুষকে ডেকেছেন। আল্লাহর তিন সত্তা বা ত্রিত্ববাদের কথা স্পষ্টভাবে তো নয়ই, ইশারা-ইঙ্গিতেও তারা কেউ বলে যান নি। একবার এক ইহুদী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তওরাত শরীফের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হুকুম কোনটা? জবাবে ঈসা বললেন, সবচেয়ে দরকারী হুকুম হল, হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord (Mark 12:29)। এছাড়া আল্লাহর ইচ্ছামত চলতে বলা, আল্লাহর এবাদতে রত থাকার আদেশ দেওয়া, আল্লাহর শুকরিয়া জানানো, আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলা, আল্লাহকে সর্বজ্ঞ বলে উল্লেখ করা, আল্লাহর রাজ্যে প্রবেশে উৎসাহিত করা, আল্লাহর কালাম প্রচার করা, আল্লাহর নিকট থেকে আসা ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলা, মোটকথা প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহকেন্দ্রিকতার যে দৃশ্য গোটা ইঞ্জিলজুড়ে দেখা যায়, তা কি তওহীদ ও আল্লাহর একত্বই নির্দেশ করে না? কুরআন মজীদও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে সেই সাক্ষ্যই প্রদান করে। যেমন ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে আখেরাতে যখন ঈসা (আ.) জিজ্ঞাসিত হবেন তখন তিনি বলবেন, 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে খুব ভাল করেই জান। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলি নি, তা এই যে, 'তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর এবাদত কর এবং যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম তত দিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সকল বিষয়ের সাক্ষী (সুরা মায়েদা ১১৬-১১৭)।

ঈসা (আ.) মনুষ্যপুত্রঃ

ইঞ্জিলের পাঠক ইঞ্জিলের পাতায়-পাতায় দেখতে পাবে কিভাবে তিনি বারবার মনুষ্যপুত্র (Son of man) বলে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। চারটি ক্যানোনিকাল গসপেলের হিব্রু টেক্সট-এ একশ' বারেরও অধিকবার ঈসা (আ.) নিজেকে 'বেন আদম' বলে আখ্যায়িত করেছেন (Matt ৯:৬; ১০:২৩; ১১:১৯; ১২:৩২, ৪০; ১৩:৪০, ৪১; ১৬:১৩, ২৭, ২৮; ১৭:৯, ১২; ১৯:২৮; ২০:১৮, ২৮; ২৪:৩০, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৩৯, Mark ২:১০, ২৮; ৮:৩১, ৩৮; ৯:৯, ১২, ৩১ অন্যান্য।)

ঈসা (আ.) আল্লাহর নবী ও দাসঃ

নিজের সম্পর্কে তিনি এ-ও বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী (Matt ১০:৪০, ৪১; ১৩:৫৭; Mark ৬:৪; Luke ১৩:৩৩; ৪:৪৩, ৪৪)। তিনি আল্লাহর গোলাম (John ১৩:১৬), আল্লাহর গোলাম হিসেবে তাঁরই এবাদতকারী (John ৪:১২)। তিনি নিজের থেকে কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না, বরং তিনি আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও তাঁর ইচ্ছা পালনকারী মাত্র (John ৫:১৯, ৩০, ৩৬; ৭:১৬, ১৭; ৪:৩৪) এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করাই তার পরম লক্ষ্য (John ৮:২৮, ২৯)।

বৈরাগ্যবাদঃ

খ্রিষ্টান যাজকেরা বিবাহ না করাসহ বিবিধপ্রকার ইন্দ্রিয়দলনকে (Monasticism) ধর্মের নিয়ম বলে সাব্যস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে ঈসার (আ.) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ বাইবেলে নেই, শুধু ধর্মের ব্যাখ্যাতাগণ তাঁর কিছু কিছু উক্তির (যেমন: Matt ১৯:১২) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই আধিক্য নিজেদের উপর আরোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেই নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এটা অবলম্বন করেছে। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলে নি (সুরা হাদীদ ২৭)। খ্রিস্টধর্মে প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে এবং যিশু (আ.) এর মূলনীতি থেকে সরে আসার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা হলো। আশা করি খোলা মনের পাঠকের বোঝার জন্য এগুলোই যথেষ্ট হবে যে, পৃথিবীর দুইশ দশ কোটি খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের কাছে ঈসার (আ.) প্রকৃত শিক্ষা নেই। এবার খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত আরো কিছু বিষয় তুলে ধরছি যা খ্রিষ্টান ও মুসলিম উভয়ের জন্য গুরুত্ববহ।

মুসার (আ.) শরিয়তের সত্যায়ন ও ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্যই ঈসার (আ.) আগমনঃ

ঈসা (আ.) এসেছেন মূলত মুসার (আ.) দীনের আধ্যাত্মিক ভাগকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য, মুসার (আ.) আনীত শরীয়াহ মোটামুটি ঠিকই ছিল। ঈসা (আ.) বলেন, "শরীয়তের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আলেমরা ও ফরিশিরা মুসা নবীর জায়গায় আছেন। এইজন্য তাঁরা যা কিছু করতে বলেন তা করো এবং যা পালন করবার হুকুম দেন তা পালন করো। কিন্তু তাঁরা যা করেন তোমরা তা

করো না, কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না (Matt ২৩:১)।" ঈসা (আ.) এর এই ঘোষণার কারণে ইহুদি ধর্ম ব্যবসায়ী রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশিরা তাঁর প্রবল বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং ঈসা (আ.) নতুন কোন ধর্ম নিয়ে আসেন নি, কোন শরিয়ত নিয়েও আসেন নি। তিনি মুসার (আ.) শরীয়তকেই সত্যায়ন করেছেন, তাই তাঁর প্রচারিত শিক্ষার মধ্যে জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, আইনকানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি অনুপস্থিত। বরং তাঁর প্রায় প্রতিটি কথাই ছিল মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য অমূল্য শিক্ষায় পূর্ণ।

সুতরাং খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা ঈসা মসীহর (আ.) প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরে আসার ফলে তারা যে পরকালে জান্নাতের আশা করছেন তাদের এই আশা ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তবে তারা যদি ঈসা (আ.) এর প্রকৃত অনুসারী হতেন তবে অবশ্যই তারা জান্নাতের আশা করতে পারতেন। তারা যদি প্রকৃতপক্ষেই ঈসা মসীহর (আ.) অনুসারী হতেন, তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক মুসার (আ.) কেতাব, শরীয়াহকে বহাল রেখে, ঈসা (আ.) এর উপদেশ অনুযায়ী আত্মিক ও মানবিক গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারতেন তবে আজকে তাদের দ্বারা চরম বস্তুবাদী এই সভ্যতার সৃষ্টি হতো না। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে সৃষ্ট এই ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী 'সভ্যতা'য় পরকালকে, আত্মার দিককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তারা জাতীয় জীবনে বস্তুতপক্ষে স্রষ্টার বিধানকে অমান্য করে নিজেরা নিজেদের বিধান রচনা করে নিয়েছেন এবং সেটা বাকি বিশ্বের উপরে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। কাজেই বর্তমানে খ্রিষ্টানরা প্রকৃতপক্ষে মুসা (আ.), ঈসা (আ.) কারোরই প্রকৃত অনুসারী নন। খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে, "হে আহলে কেতাবগণ, তোমাদের কোন ভিত্তি নেই, যতক্ষণ না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল ও তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাজিল করা হয়েছে তা পুরোপরি পালন করবে।" (সুরা মায়েদা ৬৮)। খ্রিস্টধর্মটি টিকে আছে কেবলমাত্রই কয়েকটি উৎসব যেমন: ঐশ্বরিক নৈশভোজ (Holy Communion), ক্ষমাপত্র (Indulgence) বিক্রি, ইস্টার সান ডে, বড়দিন, পাসওভার ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতাকে আশ্রয় করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম দাবিদার জনসংখ্যারও বর্তমানে প্রায় একই অবস্থা হয়েছে।

কথা ছিল, ঈসা (আ.) এর অনুসারীরা এন্টি ক্রাইস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এন্টি ক্রাইস্টের জন্মই হলো খ্রিষ্টানদের কাজের ফলে। তারা হচ্ছে এমন একজন নবীর অনুসারী যার শিক্ষা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই নবীর অনুসারী দাবিদাররাই একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দিলো কারণ খ্রিস্টধর্মের উপর অটল থেকে ঐশ্বরিক বিধান দিয়ে জাতীয় জীবন পরিচালনা করার কোন সুযোগ নেই, ঈসা (আ.) মানবজাতির জন্য কোন রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা দ-বিধি নিয়ে আসেন নি, বাইবেলে সেগুলি নেই।

Antichrist ও দাজ্জাল:

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত সত্য জীবনব্যবস্থার অবিকৃত রূপরেখা দান করেছেন। আজকে সারা পৃথিবীর সব ধর্মের সকল মানুষই আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ত্যাগ করেছে, এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের তৈরি করা জড়বাদী এক সভ্যতার অনুসরণ করছে। মাননীয় এমামুয্যামান কোর'আন, হাদীস, বিজ্ঞান ও বাইবেলের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এই বস্তবাদী সভ্যতাই হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত এন্টি ক্রাইস্ট (Antichrist- John ১:৭, ২:১৮-২২, ৪:৩, Revelation ১৩:১-১৮, ১৯:২০ এবং অন্যান্য)। কথা ছিল, ঈসা (আ.) এর অনুসারীরা এন্টি ক্রাইস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এন্টি ক্রাইস্টের জন্মই হলো খ্রিষ্টানদের কাজের ফলে। তারা হচ্ছে এমন একজন নবীর অনুসারী যার শিক্ষা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই নবীর অনুসারী দাবিদাররাই একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দিলো কারণ খ্রিস্টধর্মের উপর অটল থেকে ঐশ্বরিক বিধান দিয়ে জাতীয় জীবন পরিচালনা করার কোন সুযোগ নেই, ঈসা (আ.) মানবজাতির জন্য কোন রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা দণ্ডবিধি নিয়ে আসেন নি, বাইবেলে সেগুলি নেই। কিন্তু ঐ সমস্ত বিধান ছাড়া মানুষের জীবন চলতে পারে না। তাই জাতীয় জীবন চালাতে ঐ সমস্ত বিধানগুলি রচনার ভার তাদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হয়েছে।

যার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সভ্যতা যা প্রকৃতপক্ষে কোন ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ-সভ্যতা নয়। এটা আসলে আত্মাহীন বিবেকহীন একটা যান্ত্রিক প্রগতি মাত্র, যে প্রগতি মানুষকে যত যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে নিচ্ছে, তত তাকে মানুষ হিসাবে টেনে নিচে নামাচ্ছে। যে কোনো দিনের সংবাদপত্র খুলুন, দেখবেন পৃথিবীময় অশান্তি, ক্রোধ, রক্তারক্তি, অন্যায়, অবিচার আর হাহাকারের বর্ণনা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে যে সব দেশ এই যান্ত্রিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে, সেগুলোতে প্রতি বছর খুন, যখম, ডাকাতি, ধর্ষণ, বোমাবাজি আর অপহরণের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষের আত্মা আজ ত্রাহী সুরে চিৎকার করছে - কেন? কেন মানুষ তার জ্ঞান আর বিজ্ঞানের প্রগতিকে মনুষ্যত্বের উন্নতির পরিবর্তে অবনতির গভীর অতলে নিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মানবজাতি আজ পর্যন্ত এমন একটা জীবনব্যবস্থা তার নিজের জন্য সৃষ্টি বা প্রণয়ন করতে পারে নি যেটা পালন করলে যান্ত্রিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারে। মানুষের এখন সময় হয়েছে তার এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করারা। তাহলেই বাঁচবে মানুষ, বাঁচবে পৃথিবী।

Kingdom of Heaven:

মানবজাতির আত্মাহীন এই সভ্যতা গ্রহণ করে নেওয়ার পরিণতি কি হয়েছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। ইসলাম থেকে মুসলিম বহিস্কৃত, সনাতন ধর্ম থেকে হিন্দুরা বহিস্কৃত, ঈসার (আ.) শিক্ষা থেকে খ্রিষ্টানরা বহিস্কৃত, বৌদ্ধধর্ম থেকে বৌদ্ধরা বহিস্কৃত। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই যে স্বর্গ পরকালে পাওয়ার আশা করেন, কেউই সেটা পাবেন না। আর পৃথিবীর আখেরী যুগে (Last hour) ঈসার অনুসারীদের দ্বারা যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা সেটাও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা হবে না। যে স্বর্গরাজ্যের (Kingdom of Heaven) কথা বাইবেলে বলা হয়েছে, সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ উত্তম জীবনব্যবস্থা প্রয়োজন সেটা কোথায়? এই বর্তমান সভ্যতা অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ এসব দিয়ে কি সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব? না। সেটা চিন্তা করাও হাস্যকর ও চরম বোকামি। সেটা করার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তা ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহ তাঁর শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ.) এর উপর নাজেল করেছেন, যা তখন অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার ফলে মানবজীবন থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, বর্ণবৈষম্য, রক্তপাত দূর হয়ে অভূতপূর্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সকল ধর্মের মানুষের সর্বপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ইতিহাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই জাতি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলায় বাকি দুনিয়া সত্যদীনের সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তবে আল্লাহর রহমে এখন সময় এসেছে সেটি সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। সেই সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হলে এমন শান্তি আসবে দুনিয়াতে যে নেকড়ে আর ভেড়া একত্রে থাকবে (Isaiah 11:6)। আল্লাহর সত্যদীন সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলেই আসবে সকল ধর্মের অনুসারীদের কাঙ্ক্ষিত সেই শান্তিময় সভ্যতা, বাইবেলে ঘোষিত স্বর্গরাজ্য, সনাতন ধর্মগ্রন্থাদিতে বর্ণিত সত্যযুগের পুনরাবর্তন (বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণ)।

সকল আদম সন্তান হবে এক পরিবার:

সকল নবী ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখা সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্যই ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সে হিসাবে ইহুদি ধর্মের সকল নবী যাদের কথা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, বৈদিক ধর্মগ্রন্থাদিসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এবং কোর'আনে এসেছে তাদের প্রতি আমরা হেযবুত তওহীদের সদস্যরা ঈমান ও শ্রদ্ধা পোষণ করি এবং তাদের শিক্ষা থেকে নিজেদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করি। আমরা মানবজাতিকে একটি সাধারণ কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করছি যে বিষয়টি সকল ধর্মের মর্মবাণী, সেটা হলো: আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না। এ কথাটিই আমাদের সকলের আদি পিতা আদম (আ:), মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা নূহ (মনু) (আ.) এবং জাতির পিতা আব্রাহাম, ইব্রাহীম (আ.) বলে গিয়েছেন। যার প্রতিধ্বনি ঝংকৃত হয়েছে পবিত্র কোর'আনের আয়াতে, "বলো, গ্রন্থের অধিকারী সকল সম্প্রদায়, একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণ, তা হলো- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করব না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু বলে মানবো না (সুরা এমরান ৬৪)"। আল্লাহ তার শেষ নবী মোহাম্মদ (দ.) কে সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ জীবনব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন। ঈসা (আ.) এর শিক্ষার অধিকাংশ জুড়ে ছিল তাঁর পরবর্তী নবী আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী। ঈসা (আ.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী বার্নাবাস তাঁর গসপেলের বহুস্থানে রসুলাল্লাহ (দ.) সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কোথাও ঈসা (আ.) নবী মোহাম্মদ (দ.) এর নাম নিয়েছেন, কোথাও রসুলাল্লাহ বলেছেন, কোথাও বা তাঁর জন্য মসীহ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোথাও প্রশংসনীয় (আহমদ, Admirable) কোথাও এমন

সুস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছেন যা একেবারে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ" এর সমার্থবোধক। এখানে একটি মাত্র ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করছি। ঈসা (আ.) তাঁর আসহাবদেরকে বলছেন, "বিশ্বাস করো আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্মান জানিয়েছি। এভাবে সকল নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহকে দর্শনের মাধ্যমে নবীগণ নব্যুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম আত্মা প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, O Muhammad;, God be with you, and may he make me worthy to untie your shoelatchet; for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God. হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমাকে তিনি আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান করুন। কারণ আমি যদি এই মর্যাদা লাভ করি তাহলে আমি একজন বড় নবী হবো এবং আল্লাহর একজন পবিত্র মানুষ হয়ে যাবো। (The Gospel of Barnabas, Chapter 44)".

এখন মানবজাতিকে ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে একটাই উপায়, আল্লাহর সত্যদীনের কাছে ফিরে যেতে হবে, যা পালন করলে যান্ত্রিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারবে। মাননীয় এমামুয্‌যামান আবার আল্লাহর দয়ায় সেই সত্যদীনে প্রকৃত আলো মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

ঈসার (আ.) ৫৭০ বছর পর যখন মহানবী আসলেন তখন বহু খ্রিষ্টান তাঁকে প্রতিশ্রুত নবী হিসাবে চিনতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের যারা মূল ধারক-বাহক তারা কায়েমী স্বার্থে শেষ নবীকে স্বীকার করেন নি এবং বাইবেল থেকে তাঁর প্রসঙ্গে যত কথা আছে সব মুছে দেয়ার চেষ্টা করেন। এই বিকৃতির অতি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বিকৃতির ধারাবাহিকতায় ১৬৬১ সনে পূর্বের বাইবেলগুলিকে সংশোধন করে প্রকাশ করা হয় King James Authorised Version যা আরও সংশোধন, পরিমার্জন ও মানোন্নয়ন অর্থাৎ Revision করে ১৮৮১ সালে আবারও প্রকাশ করা হয় Revised King James New Testament নামে। তবুও মহানবীর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের পাতায় এখনও খুঁজে পাওয়া যায় যা মূল সুরিয়ানী (Koine Greek) থেকে গ্রীক, গ্রীক থেকে ইংরেজী হয়ে যখন বাংলায় অনুদিত হয় তখন সেটার রূপ এতটাই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে রীতিমত গবেষণা করতে হয় (যিশু খ্রিস্টের অজানা জীবন- আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ)। John ১৪:১৫ তে একজন সাহায্যকারীর (Advocate, Helper) আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঈসা (আ.)। গ্রীক বাইবেলে এই সাহায্যকারী ব্যক্তিকে বলা হয়েছে ফারক্লিত (Paracletus/ Periclytos), আর মূল সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত ইঞ্জিলে এ শব্দটি ছিল মুন্‌হামান্না যা ইবনে ইসহাক তার সেরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই মুন্‌হামান্নাই হচ্ছে মোহাম্মদের উচ্চারণভেদ (পরধর্মগ্রন্থে শেষ নবী- মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভুঞা)। সুতরাং ঈসা (আ.) নবী মোহাম্মদ (দ.) এর নাম নিয়েই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি এরপরে আর তোমাদের সাথে বেশি কথা বলব না। কারণ দুনিয়ার শাসনকর্তা (Ruler of this world) আসছেন (John ১৪:৩০)। খ্রিষ্টানরা তাদের নবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করেছে। এখন মুসলিমরাও রসুলাল্লাহর আনীত সেই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই, তারাও দাজ্জালের দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মতই পথভ্রষ্ট হয়ে কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের এ পরিণত হয়েছে। এখন মানবজাতিকে ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে একটাই উপায়, আল্লাহর সত্যদীনের কাছে ফিরে যেতে হবে, যা পালন করলে যান্ত্রিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারবে। মাননীয় এমামুয্‌যামান আবার আল্লাহর দয়ায় সেই সত্যদীনে প্রকৃত আলো মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে আমরা আহ্বান করছি আসুন আমরা একটা কথার ওপর এক হই, আপনাদের এবং আমাদের প্রভু এক। আমরা শুধু তাঁর হুকুম মানবো, আর কারও হুকুম মানবো না। তাহলেই পৃথিবীতে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের যে আকাঙ্ক্ষিত Kingdom of Heaven আসবে ইনশা'আল্লাহ। সনাতন ধর্মের সত্যযুগ, রামরাজ্য বা Kingdom of God, আর বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা নবুয়্যতের আদলে খেলাফত (দালায়েলুম নবুয়াত- বায়হাকী, মুসনাদ- আহমদ বিন হাম্বল, মেশকাত) অতি শীঘ্রই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এনশা'ল্লাহ। পবিত্র বড়দিনে আমরা সমগ্র মানবজাতিকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছি এবং সত্য গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান করছি।

লেখক: এমাম, হেযবুত তওহীদ;
চেয়ারম্যান, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সোসাইটি।

প্রসঙ্গ: জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা

রিয়াদুল হাসান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। জেরুজালেমকে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম এই তিন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদের পবিত্র ভূমি বলে দাবি করে। মেরাজের ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত মুসলিম জাতির প্রথম কেবলা ছিল এই জেরুজালেম যার দখল নিয়ে সেই ক্রুসেডের যুগ থেকে হাজার বছরের অধিককাল ধরে এই জাতিগুলোর মধ্যে রক্তপাত চলছে। এই ঐতিহাসিক শহরটি বহু আগেই ইসরাইলের দখলে চলে গেছে এবং এখন তারা একে তাদের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই ঘটনাটি অনেক মুসলিমই মেনে নিতে পারছেন না। অনেক দল, গোষ্ঠীর মধ্যে এ নিয়ে উত্তেজনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক দল কিছু একটা করা দরকার মনে করে রাস্তা দিয়ে দল বল নিয়ে মিছিল করে আসার মত কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে। একে তারা একপ্রকার জেহাদ হিসাবে মনে করে আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে হলে কয়েকটি বিষয় ভাবতে হবে।

- মুসলিমরা আজকের এই অবস্থায় কী করে আসলো? একটি সময়ে তারা তো জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সামরিক শক্তিতে সকল জাতির সেরা জাতি ছিল, বাকি পৃথিবী তাদের দিকে সভয় সম্ভ্রমসহ চেয়ে থাকত। আজকে সেই তারা কোন অপরাধে পৃথিবীর সকল জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত। তাদের দেশগুলো বোমার আঘাতে লণ্ডভণ্ড। তাদের সাড়ে ছয় কোটি মানুষ উদ্বাস্তু। তাদের নারীরা ইজ্জতহারা।
- তারা তো এক জাতি ছিল, তাদের একটি লক্ষ্য ছিল। আজকে তারা নিজেরা নিজেরা কী কারণে হাজারো তরিকা, ফেরকা, মাজহাব, দলাদলি করে মারামারিতে ব্যস্ত। এই যখন মুসলমানদের অবস্থা তখন শুধু জেরুজালেম নয় খোদ পবিত্র মক্কা-মদীনাও যদি কেউ দখল করে নেয় তাহলে সেটা ঠেকানোর বিন্দুমাত্র সামর্থ্য এই শতধাবিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীর আছে বলে অন্তত আমি মনে করি না।

আমরা যদি কার্যকর কিছু করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দলাদলি ফেরকা মাজহাব ভুলে আগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ এখন পশ্চিমা প্রভুদের হাতে। আমরা মুসলিমরাও গত কয়েকশত বছর পূর্ব থেকেই আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা বাদ দিয়ে ঐ পশ্চিমা প্রভুদেরই পদলেহন করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় জেরুজালেম বা এ জাতীয় কোনো ইস্যু নিয়ে রাস্তায় যানজট বাঁধিয়ে, ঈমানের জজবা প্রদর্শন করে, লক্ষ লক্ষ টুপি দেখিয়ে যতই বিক্ষোভ, মিছিল, হাঙ্গামা করি, ট্রাম্পের কুশপুত্তলিকা দাহ করি, ইসরাইলের পতাকা পোড়াই, দূতাবাস ঘেরাও করি কোনো লাভ হবে না। অসারের তর্জন গর্জনই সার হবে।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

ইসলামের প্রকৃত সালাহ্

আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর যে চরিত্র অপরিহার্য সেই চরিত্র তৈরির প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ (নামায)। অথচ সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে আজ সালাহকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সওয়াবের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। যে সালাহ উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা উম্মাহ আজ হাজারো পথে বিভক্ত। কারণ সালাহর প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে। ইসলামের প্রকৃত সালাহর রূপ জানতে প্রতিটি সত্যানুরাগী মানুষের বইটি পড়া জরুরি।

hezbuttawheed.org

যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩ । ০১৭১১০০৫০২৫ । ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ । ০১৭৮২১৮৮২৩৭

কে মুসলমানদেরকে অসার তর্ক-বাহাসে লিপ্ত করলো?

রিয়াদুল হাসান

সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে এক আল্লাহ, এক রাসুল, এক কেতাব, এক উম্মাহ ও এক জাতি উম্মতে মোহাম্মদী, যে জাতিটিকে তৈরি করেছিলেন আখেরী নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হুজুরে পাক (স.)। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, অকল্পনীয় ত্যাগ, কঠোর অধ্যবসায় ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আরবের তৎকালীন আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অনৈক্য, হানাহানি, অজ্ঞাতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে তিনি একটা মহান জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না, একেক জনের একেক লক্ষ্য ছিল। রসুলাল্লাহ সবাইকে এক লক্ষ্যের অভিমুখী করেছেন। তাদের কোন ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা ছিল না, তাদের জীবনের কোন কর্মসূচি ছিল না, রসুলাল্লাহ তাদেরকে কর্মসূচি দিয়েছেন। তাদের কোন আদর্শ ছিল না, তিনি তাদেরকে একটি আদর্শের উপর দাঁড় করিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন দুই-দুইটি পরাশক্তিকে পদানত করে অর্ধ পৃথিবীতে সাম্য সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা দাসত্বব্যবস্থা দূর করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রসুলাল্লাহর এন্তেকালের পর সেই জাতির লক্ষ্য যেন ঠিক থাকে এজন্য রসুল তাদেরকে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেলেন যার মধ্যে বিদায় হজের ভাষণ অন্যতম। তারা যেন কোনভাবেই ঐক্য নষ্ট না করে, শৃঙ্খলাভঙ্গ না করে, আনুগত্য ভঙ্গ না করে এজন্য বার বার করে এই কথাটি তিনি বললেন যে, "যদি কিসমিসের ন্যায় ক্ষুদ্র মস্তকবিশিষ্ট কোন নাক বা কানকাটা (অর্থাৎ বিকলাঙ্গ) ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয় তোমরা তার কথা শুনবে এবং মান্য করবে, অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে তা আনুগত্য করবে [হাদিস, উম্মুল হোসাইন (রা.) থেকে মুসলিম, আনাস (রা.) থেকে বোখারি]।" তিনি আরো বললেন, তোমরা আল্লাহর হুকুম থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কেতাব ও অপরটি রসুলের সুন্নাহ। তিনি জাতিকে পাঁচদফা কর্মসূচি দিয়ে বলে গেলেন যে এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ করে আমি চলে যাচ্ছি। সেগুলো হলো:

১. *সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে) ঐক্যবদ্ধ হও।*

২. *যিনি নেতা হবেন তার আদেশ) শোন।*

৩. *নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।*

৪. *হেযরত (অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ) করো।*

৫. *এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো। (এখানে জেহাদ অর্থ: সর্বাত্মক চেষ্টা, প্রচেষ্টা।)*

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

রসুলাল্লাহর এই সব নির্দেশনা অনুসরণের ফলে আরব জাতির ইতিহাস পাল্টে গেল। তারা অবিশ্বাস্য সামরিক বিজয় অর্জন করল, অতঃপর তারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আর্থিক সমৃদ্ধিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলো। কিন্তু এরই মধ্যে যে আকিদার উপর, লক্ষ্যের উপর আল্লাহর রসুল জাতিটিকে রেখে গিয়েছিলেন ইবলিসের প্ররোচনায় জাতিটি তাদের সেই আকিদা, লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। তারা সংগ্রাম ত্যাগ করল। জাতির শাসকশ্রেণি অর্ধেক

পৃথিবীর ভূসম্পত্তি ও সম্পদ হাতে পেয়ে অন্যান্য সব রাজা-বাদশাহদের মত ভোগ বিলাস, আরাম আয়েশে গা এলিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে রাজনৈতিক বিভক্তি সৃষ্টি হলো। যে জাতি ছিল সার্বক্ষণিক সংগ্রামে লিপ্ত তারা সংগ্রাম ত্যাগের পর বিপুল অবসর পেয়ে দীন নিয়ে গবেষণা করার জন্য কাগজ কলম নিয়ে ঘরে ঢুকল। জাতির মধ্যে জন্ম নিল ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী। জন্ম নিল বহু ইমাম, ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ। তারা দীনের শরিয়তের ও মারেফতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে নিয়ে চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে লেগে গেল। তারা রসুলের জীবনের ও কথার প্রতিটিকে ধরে ধরে মাসলা-মাসায়েল আবিষ্কার করতে করতে হাজার হাজার ফতোয়ার কেতাব রচনা করে ফেললেন। সহজ সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম) ইসলামটি হারিয়ে গেল। সেটা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের কুক্ষিগত হয়ে গেল। তা এতই বৃহদায়তন ও দুর্বোদ্ধ হয়ে গেল যে এখন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একজীবনে ইসলাম পূর্ণরূপে পালন করা তো দূরের কথা, পুরোপুরি জানাটাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। গোটা জাতি সেই দুর্বোদ্ধ ইসলামের মাসলা মাসায়েলের মাকড়সার জালে আটকে স্থবির হয়ে গেল। শরিয়তের ব্যাখ্যাকে ঘিরে তারা শত শত মাজহাব ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে শিয়া ও সুন্নী হলো প্রধানতম দুটো বিভক্তি যাদের উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ও আকিদাগত মতবিরোধ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল এবং আজও আছে।

আর সেই সঙ্গে ইসলামের মধ্যে ঘটল ভারসাম্যহীন সুফিবাদের অনুপ্রবেশ। তারাও সংগ্রাম বিমুখ, অন্তর্মুখী ইসলাম জাতিকে শেখাতে লাগল যার দরুন জাতির আরেকটি বড় ভাগ আত্মার ঘষামাজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের মাধ্যমে এই জাতির মধ্যে বহু প্রকার আধ্যাত্মিক তরিকার বিস্তার ঘটল। সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে বহু পৃথক পৃথক সুফিবাদী গোষ্ঠী রয়েছে।

এই সব জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত ফল হয়েছে এই যে, এক সময়ের লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ, দুর্বার দুর্বিনীত শত্রুর বুকে ত্রাস সৃষ্টিকারী জাতিটি আজ বিড়ালের মতো ভীরু কাপুরুষে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী আলেমগণ মৌলিক মূল সহজ সরল ইসলাম থেকে সরে গিয়ে তাদের ক্ষুরধার মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার কর্মঘণ্টা শ্রম ব্যয় করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, মতামত, মাসলা মাসায়েল নিয়ে কূটতর্কে জাতিকে লিপ্ত করে গেলেন। এখনও সেই কূটতর্ক বাহাসের ধারাবাহিকতা বহমান রয়েছে। দেশের সর্বত্র ওয়াজের মৌসুম আসলেই শুরু হয় কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিতর্ক যেমন নবী নূরের নবী না মাটির তৈরি, দ্বোয়ালদীন হবে না যোয়াল্লীন হবে, মিলাদের মধ্যে কেয়াম হবে নাকি বেকেয়াম হবে, রসুল হায়াতুন্নবী নাকি তিনি এন্তেকাল করেছেন, তাঁর প্রশ্রাব পায়খানা পাক নাকি নাপাক ইত্যাদি। সমগ্র বিশ্বে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে, মুসলিমরা বিশ্বময় নির্যাতিত, উদ্বাস্তু হচ্ছে তখন ও আমাদের ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামারা এসব নিয়ে মহাব্যস্ত। কারণ এগুলোই তাদের উপার্জনের মাধ্যম। যতদিন না মুসলিম নামক এই জনগোষ্ঠীকে এই সব ক্ষুদ্রতার গণ্ডিবদ্ধতা থেকে উদ্ধার করে বিশ্বজনীন দৃষ্টি প্রদান করা যাবে ততদিন এই জনগোষ্ঠীর মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা ঐ কুয়োর ব্যাঙের মতই জীবন কাটিয়ে কুয়োর মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

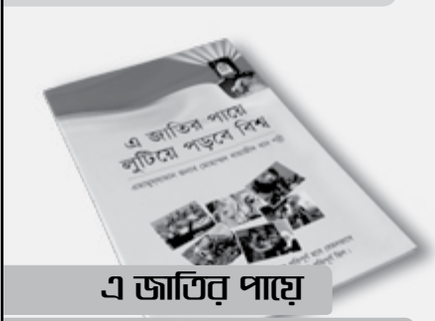

এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

রসুলাল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, পশ্চাৎপদ আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ষোল কোটি বাঙালিকে হেযবুত তওহীদ আহ্বান করছে, যদি কলেমা-তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

: 01782188237 | 01670174643 | 01711005025 | 01933767725

প্রসঙ্গ: সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মসজিদের মাইক ব্যবহার

রিয়াদুল হাসান

প্রায়ই শুনি, বাংলার মানুষ ধর্মান্ধ নয়, ধর্মপ্রাণ ধার্মিক, সংস্কৃতিমনা, যুগ যুগ ধরে এখানে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে তাই এখানে উগ্রতার সংস্কৃতি কখনোই গৃহীত হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা বোঝেন না যে, সময় অনেক পাল্টেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল না তা এখন হরদম চলছে। বিশ্বের অন্তত একশ'টি ফ্রন্টে একসাথে যুদ্ধ চলছে, যার সবগুলোর পেছনে আছে ধর্ম ও ধান্ধাবাজির রাজনীতিকে ব্যবহার করে আধিপত্যবাদ। আমাদের এখানে গত কয়েক দশক থেকে মানুষের ধর্মানুভূতিকে বার বার হাইজ্যাক করে হিংস্রতার চর্চা করা হচ্ছে।

মসজিদের মাইকে নামাজের আহ্বান শুনে কতজন মুসল্লী মসজিদে উপস্থিত হন? কিন্তু আমাদের দেশে যখনই মসজিদের এই মাইক ব্যবহার করে ধর্ম অবমাননার ভুয়া ঘোষণা দেওয়া হয় তখনই হাজার হাজার 'ধর্মপ্রাণ, শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক তওহীদী জনতা' ধারালো অস্ত্র, লাঠিসোটা, রাম দা, কিরিচ নিয়ে হজির হয়ে যায়। তারপর যা করে তাকে পাশবিকতা বলব না, কারণ এদের বন্যতা, হিংস্রতা দেখে যে কোনো পশুও লজ্জিত হবে।

আমি সুশীলদের বলছি, আপনারা আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না। ধর্মের অনুভূতি যখন একটি গোষ্ঠীর হাতে জমা রেখেছেন তখন মনে রাখবেন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র কোনো সিরিয়াল কিলারের হাতে বন্ধক রেখেছেন। সে এই অস্ত্র যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করবে আপনার কিছুই করার থাকবে না। তাদের মাথায় ও বিভিন্ন স্থানে হাত বুলিয়ে শেষ রক্ষা হবে না। একটাই উপায় মানুষকে ধর্মের প্রকৃত রূপটি শিক্ষা দিন। মানুষের ধর্ম যে মনুষ্যত্ব তা শিক্ষা দিন, সমাজে শান্তি রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস করাই যে এবাদত এটা শিক্ষা দিন। মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজই গোনাহের কাজ আর কল্যাণ হয় এমন কাজই সওয়াবের কাজ সেটা উপলব্ধি করুন।

তাকে বলুন, যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত তার নামাজ রোজা কবুল হয় না। তাকে বলুন, ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে তোমাদেরকে ঈমানকে ব্যবহার করছে। ঈমান তোমার সম্পদ, তাকে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাও- মানবতার অসম্মান

আমি সুশীলদের বলছি, আপনারা আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না। ধর্মের অনুভূতি যখন একটি গোষ্ঠীর হাতে জমা রেখেছেন তখন মনে রাখবেন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র কোনো সিরিয়াল কিলারের হাতে বন্ধক রেখেছেন। সে এই অস্ত্র যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করবে আপনার কিছুই করার থাকবে না।

করার জন্য লাগিও না, দেশ ধ্বংসের জন্য লাগিও না। তাদেরকে শেখান, মসজিদ নির্মাণ যেমন সওয়াবের কাজ তেমনি মানুষ চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ করাও এবাদত। মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য যে তারা ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে। তাদেরকে শেখাতে হবে, গুজবে কান দেওয়া, হুজুগে মাতা, কোনো সংবাদ যাচাই না করে কারো বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এটা কোনো মো'মেনের কাজ না।

কেউ অন্যায় কিছু লিখলে বা বললে তার প্রতিবিধান করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন আছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, সাংগঠনিক পর্যায়ে একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা যায় কিন্তু আইন হাতে তুলে নিয়ে দণ্ড কার্যকর করতে হলে অবশ্যই আগে কর্তৃপক্ষের আসনে তোমাকে বসতে হবে। এই কথাগুলো বলার দায়িত্ব ছিল যাদের তারা বলবেন না, কারণ তাদের কায়েমী স্বার্থ নষ্ট হবে। এই কথাগুলো তাই সবাইকে বলতে হবে। শতকণ্ঠে বলতে হবে। কেউ যদি বলে তোমার দাড়ি কোথায়, লেবাস কোথায় তাকে বলুন, চিন্তা করবেন না। আজ রাখি নি, কাল রাখতেও তো পারি। আগে আসুন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ঐক্যবদ্ধ হওয়া ফরজ। আগে ফরজ কাজটি করি। ধর্মের নামে অনাচার আর অধর্ম চালু রাখলে আল্লাহর এবং ইসলামের অবমাননা করা হয়। আগে একে প্রতিহত করি।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

এখন কী করবে মুসলমানেরা?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আমরা মুসলিম নামক জাতিটি বর্তমানে কালের এমন একটি বিন্দুতে এসে উপনীত হয়েছি যেখানে আজ আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। একটার পর একটা মুসলিমপ্রধান দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তান ধ্বংস হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে আবারও চলছে ধ্বংসের উন্মাদনা। সিরিয়ায় গত কয়েক বছরে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করা হচ্ছে। ভয়ানক রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ হচ্ছে যার প্রথম শিকারে পরিণত হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুগুলো। কিছুদিন আগেই একটি রাসায়নিক হামলায় ছটফট করতে করতে মারা গেল ২৭টি শিশু। লেবাননে রক্ত ঝরছে মুসলমানের। আফ্রিকার ত্রাতা বলে পরিচিত সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল লিবিয়া। মুসলিমপ্রধান এই দেশটি সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গিবাদী তাণ্ডবে আজকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় চলছে খরা ও দুর্ভিক্ষ। মায়ানমারে, ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উপর কী নির্মম পৈশাচিকতা চলছে তা সারা বিশ্বের মানুষ সম্প্রতি অবলোকন করেছে। এইভাবে বিশ্বের সর্বত্র আক্রান্ত হচ্ছে মুসলমানরা। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্তত ছয় কোটি মানুষ উদ্বাস্তু যাদের প্রায় সবাই মুসলমান। যে দেশগুলো এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি সেগুলোও যে খুব নিরাপদে আছে তা নয়। প্রত্যেকটা মুসলিমপ্রধান দেশে আস্তানা গাড়ছে জঙ্গিবাদ। আর সেই জঙ্গিবাদের সূত্র ধরে জঙ্গিদমনের নামে দেশ দখল করে নেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীল নকশা করছে বিশ্বর পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। বলা বাহুল্য, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশও এখন এই ভয়াল থাবায় আক্রান্ত।

আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় ১৬০ কোটি হলেও ভৌগোলিকভাবে আমরা ৫৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত; শরীয়াগতভাবে শিয়া-সুন্নি, হানাফি, হাম্বলি, শাফেয়ী ইত্যাদি ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত। শিয়াদের মধ্যে আবার আছে শত শত দল-উপদল। সুন্নিদের মধ্যেও তেমন। রয়েছে হাজার হাজার পীর। সেই একেক পীরের একেক রকম তরিকা। আবার ইসলামের নামে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার রাজনৈতিক দল। একেক দলের একেক কর্মসূচি। জঙ্গিবাদী দলের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাদের মধ্যে একটি দলের আকীদার সাথে আরেক দলের আকীদায় বিস্তর তফাৎ।

এ এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা যে, আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় ১৬০ কোটি হলেও ভৌগোলিকভাবে আমরা ৫৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত; শরীয়াগতভাবে শিয়া-সুন্নি, হানাফি, হাম্বলি, শাফেয়ী ইত্যাদি ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত। শিয়াদের মধ্যে আবার আছে শত শত দল-উপদল। সুন্নিদের মধ্যেও তেমন। রয়েছে হাজার হাজার পীর। সেই একেক পীরের একেক রকম তরিকা। আবার ইসলামের নামে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার রাজনৈতিক দল। একেক দলের একেক কর্মসূচি। জঙ্গিবাদী দলের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাদের মধ্যে একটি দলের আকীদার সাথে আরেক দলের আকীদায় বিস্তর তফাৎ। আর মাঝখানে সাধারণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও নাই ইসলাম সম্পর্কে। তারা না জানে কোরআন, না জানে হাদিস, না জানে ইসলামের ইতিহাস। হালবিহীন নৌকার মত বাতাস যেদিকে যাচ্ছে তারাও সেদিকে ছুটছে। ইসলাম জানার ও মানার জন্য এই সাধারণ জনগণকে নির্ভর করতে হয় এমন একটি শ্রেণির উপর যারা ধর্মকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিকসহ নানাবিধ স্বার্থ হাসিল করে থাকে। তারা যেটাকে ইসলাম বলে সেটাই সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ইসলাম মনে করে। এই শ্রেণিটির পিছু পিছু কেউ যাচ্ছে পীরের আস্তানায়, কেউ যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে, কেউ যাচ্ছে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে, কেউ ঢুকছে মসজিদে-মাদ্রাসায়; কেউবা ধর্ম-কর্মের তালে না থেকে পশুর মত আহার-বিহার-নিদ্রার মধ্যেই জীবনকে আবদ্ধ করে রেখেছে। ওদিকে জাতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যে চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে, এই জাতিকে বিশ্বময় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে সেদিকে কারো

খেয়ালই নেই। তাদের খেয়াল নেই যে, সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে প্রত্যেকটি মুসলিমপ্রধান দেশের সরকারের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে হিমশিম খাচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। নতুন নতুন বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। জঙ্গিদেরকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে, গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে, ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। এক কথায় প্রচেষ্টার কোনো অন্ত নেই। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

এখন মুসলিম নামক জাতিটিকে সম্মিলিতভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে এই সঙ্কট কোনো নির্দিষ্ট দেশের সঙ্কট নয়, কিংবা কেবল কোনো সরকারের একার সঙ্কট নয়। এই সঙ্কট সমগ্র মুসলিম জাহানের সঙ্কট। বিশ্বময় মুসলিম নামক জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই এই জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা। কাজেই এখন সবাইকে ভাবতে হবে কীভাবে তারা তাদের দেশকে, তাদের জাতিকে, তাদের সমাজকে রক্ষা করবে। কীভাবে তারা অনিবার্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের সন্তানদেরকে রক্ষা করবে।

এখন মুসলিম নামক জাতিটিকে সম্মিলিতভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে এই সঙ্কট কোনো নির্দিষ্ট দেশের সঙ্কট নয়, কিংবা কেবল কোনো সরকারের একার সঙ্কট নয়। এই সঙ্কট সমগ্র মুসলিম জাহানের সঙ্কট। বিশ্বময় মুসলিম নামক জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই এই জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা। কাজেই এখন সবাইকে ভাবতে হবে কীভাবে তারা তাদের দেশকে, তাদের জাতিকে, তাদের সমাজকে রক্ষা করবে। কীভাবে তারা অনিবার্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের সন্তানদেরকে রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে কে কত বড় আলেম, কে কত বড় পীর, কে কত বড় প্রভাবশালী নেতা, কার কত লক্ষ অনুসারী- এইসব আত্মাভিমান ছুড়ে ফেলে এই জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আমাদের সবাইকে এক টেবিলে বসতে হবে। এই বিপর্যয় এখনও এড়ানো সম্ভব কিন্তু তার জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ জনগণ সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। এখানে দেখা চলবে না কে কোন মতের, কে কোন দলের। ন্যায্য কথা যে-ই বলুক সেটা গ্রহণ করতে হবে। সমাধানের উপায় যে-ই প্রদান করুক সেটা ভেবে দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে হেযবুত তওহীদের কথা হচ্ছে- ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে যদি ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা, আরবিতে যাকে বলে 'আকীদা' শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তাদের ঈমানকে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল আর ভুল খাতে প্রবাহিত করে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করতে পারবে না। কেননা আকীদা হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির মত যা একজন মানুষের সামনে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, বৈধ-অবৈধ স্পষ্ট করে দেয়। ফলে তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবে যে কেন জঙ্গিবাদ ভুল পথ, কীভাবে এই পথ মানুষের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করে দেয়। সেই সাথে এও বুঝতে পারবে যে কোনটা সঠিক পথ। এককথায় মানুষের সামনে প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা সম্যকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমরা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে পাই বিশ্বনবী কঠোর পরিশ্রম করে সর্বপ্রথম একটি জাতি গঠন করেছিলেন। সেই জাতির সদস্যরা একটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছিল যে, 'তারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবে না, আর আল্লাহর রসুল হবেন তাদের নেতা, পথ প্রদর্শক।' সেই মোতাবেক তারা 'এক নেতা এক হুকুম' এর অধীনে একটি জাতীয় সিস্টেম গড়ে তুলেছিল। সেই নেতার (রসুলাল্লাহ) নির্দেশে তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত হত। সেই নেতাই ঠিক করে দিতেন জাতির শৃঙ্খলা কী হবে, কে কার আনুগত্য করবে, সামাজিক ব্যবস্থা কেমন হবে, সামরিক বাহিনী কেমন হবে ইত্যাদি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে আল্লাহ কোর'আনের আয়াত নাজেল করে তার সমাধান দিতেন। আর আল্লাহর রসুল (সা.) পরিস্থিতি বুঝে জাতির কল্যাণের কথা ভেবে যেভাবে যেই আয়াতের প্রয়োগ ঘটানো ভালো মনে করতেন সেইভাবে প্রয়োগ করতেন। তাতে কেউ বাধা দিত না বা আপত্তি করত না, কারণ সবাই তো আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা ও বিশ্বনবীকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এইভাবে একদেহ একপ্রাণ হয়ে ওই জাতিটি তাদের লক্ষ্যের

দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেই লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার স্থাপন করা।

এরপর রসুলাল্লাহ ইন্তেকাল করলে জাতির সদস্যরা বসে পরামর্শ করে তাদের একজন নেতা ঠিক করে নিল এই শর্তে যে তিনি আল্লাহর হুকুম ও রসুলের সুন্নাহ মোতাবেক জাতিটিকে পরিচালিত করবেন। এইভাবে চলল মোটামুটি ৬০/৭০ বছর। এই সময়টিতে জাতি আল্লাহ-রসুলের নির্দেশিত পথে ও নির্দেশিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদেরকে বিজয় দান করতে লাগলেন। ফলে কিছুদিন আগেও যেই জাতিটি ছিল পৃথিবীর সবচাইতে বর্বর, অশিক্ষিত, দরিদ্র একটি জনগোষ্ঠী, তারাই সামরিক শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আর্থিক প্রাচুর্য সর্বদিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করল। কিন্তু তারপর ঘটল এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। হঠাৎ জাতিটি লক্ষ্য ভুলে গেল। শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে শাসকরা মেতে উঠল ভোগ বিলাসিতায়। জাতি হয়ে পড়ল গতিহীন, স্থবির। যতক্ষণ জাতির সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল ততক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ, অনৈক্য ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে নি। সবাই এক দেহ এক প্রাণ হয়ে কেবল সংগ্রাম করে গেছে, আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বরাবরই বিজয় দান করেছেন। কিন্তু এবার যখন সেই লক্ষ্য থেকে জাতিটি বিচ্যুত হয়ে গেল, এই প্রথম বিভিন্ন দিকে তাদের দৃষ্টি পড়তে লাগল, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের দৃষ্টি আটকে যেতে লাগল। একদল শুরু করল দীনের চুলচেরা অতি বিশ্লেষণ। আরেকদল ব্যস্ত হয়ে পড়ল আত্মার ঘসামাজা করে কুরবিয়াত হাসিলের কাজে। আর সাধারণ লোকেরা যে যার মত জীবনপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিল। জাতি একদিকে স্থবির, আর অন্যদিকে বিভক্ত হয়ে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলল। এইভাবে চলল কয়েকশ' বছর।

আল্লাহ কোর'আনে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন 'সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করলে মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়া হবে', আল্লাহর রসুল বলেছেন 'যারা আমার সুন্নাহ ছেড়ে দিবে তারা আমার কেউ নয় আমি তাদের কেউ নই'। এর কিছুই যখন জাতির মনে রইল না, সব ভুলে গিয়ে যখন তারা তর্ক-বাহাস আর ফতোবাজীতে মেতে থাকল, নিজেরা নিজেরা অনৈক্য-মতভেদে ডুবে থাকল, তখন আল্লাহ এদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বর্বর হালাকু খানের সৈন্যরা। মুসলমানদের রক্তে ফোরাত নদী লাল হলো। তাদের মস্তক দিয়ে হালাকু খান পিরামিড বানালো। নারী-শিশুদেরকে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হলো না। স্বয়ং খলিফাকে লাঞ্ছনা আর অপমানের সাথে হত্যা করা হলো। এভাবে হালকু খান কচুকাটা করে গেল কিন্তু তবু এদের হুঁশ হলো না। তারা আবার ফিরে গেল সেই হুজরা, খানকায়। সেই বাহাস, তর্কাতর্কি, চুলচেরা বিশ্লেষণ, আধ্যাত্মিক ঘসামাজাই শুরু হলো নতুন উদ্যোমে। আবার শুরু হলো শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার রাজত্ব। ফলে এবার এলো চূড়ান্ত মার খাওয়ার পালা। ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিগুলো সামরিক শক্তিবলে এবার প্রায় সমগ্র মুসলিম জাতিটিকেই গোলাম বানিয়ে ফেলল। এদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিস্টেম বদলে পাশ্চাত্যের তৈরি সিস্টেম কার্যকরী করল। যে ফিকাহর বই নিয়ে এত চুলচেরা বিশ্লেষণ, এত ফেরকাবাজি, ফতোয়াবাজি, আদালত থেকে সেই ফিকাহ-কোর'আন ছুঁড়ে ফেলে সেখানে দখলদার জাতিগুলোর তৈরি আইন-কানুন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হলো।

এই সময় সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ যে ঘটনাটা ঘটল সেটা হচ্ছে মুসলিম জাতি যে শর্তের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল অর্থাৎ 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবে না'- সেই শর্তটা এবার ভঙ্গ হয়ে গেল। কেননা জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে তাদেরকে এবার মেনে নিতে হলো ব্রিটিশদের হুকুম। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী আল্লাহর হুকুম (বিকৃতভাবে হলেও) মেনে অভ্যস্ত। তাদের একটি প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম ছিল। একটি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল যুগের পর যুগ ধরে। তাদের প্রচলিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। এগুলো কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ছিল না, সেখানে ঈমানী বাধ্যবাধকতাও ছিল। কিন্তু সেটাকে অচল করে দিয়ে তাদের মাথার উপর ব্রিটিশরা আরেকটি হুকুমত চালু করে দিল। তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার বিপরীতে ব্রিটিশরা দাঁড় করালো আরেকটা রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা। তাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড় করানো হলো আরেকটা শিক্ষাব্যবস্থা। তাদের আইন-কানুন দণ্ডবিধির বিপরীতে চালু করা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আইন-কানুন, দণ্ডবিধি। এক কথায়, এতদিন যে হুকুম দেওয়ার এখতিয়ার ছিল কেবলই আল্লাহর, সেই হুকুমের ক্ষমতা চলে গেল ব্রিটিশের হাতে। আর মুসলমানরা হয়ে গেল ব্রিটিশের হুকুমের গোলাম। শুরু হলো মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবনের সংঘাত!

এই যে ঘটনাটি ঘটল, এটা মুসলিমদের ক্ষেত্রে যতটা প্রবল সঙ্কট হয়ে দাঁড়াল তা কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হয় নি। অন্যান্য ধর্মগুলো হাজার হাজার বছরে এমনিতেই এতখানি বিকৃত হয়ে গেছে যে, তা দিয়ে কোনো জাতির সমষ্টিগত

জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অনেক ধর্মে তো জাতীয় জীবন পরিচালনার কোনো বিধানই নেই। কাজেই ঐসব ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় জীবনে কার হুকুম চলছে বা না চলছে তা নিয়ে তাদের কোনো ঈমানী বাধ্যবাধকতাও নেই। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। একটা জীবন্ত ইতিহাস রয়েছে ইসলামের। কিছুদিন আগেও মুসলিমরা দুনিয়া শাসন করেছে। একটি সুমহান সভ্যতার জন্মদাতা তারা। তারা আবু বকর (রা.), ওমরের (রা.) শাসনামল নিয়ে আজও গর্ব করে। এই জাতির প্রাণশক্তি যে কোর'আন, তা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা 'অপরিবর্তনীয়' ও 'অবিকৃত' আছে। সেখানে হাজার হাজার আয়াত রয়েছে মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সাথে জড়িত। সেই আয়াতগুলোর বাস্তবায়ন করা মুসলিমদের ঈমানী বাধ্যবাধকতার অংশ। কিন্তু জাতীয় জীবনে হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা যখন তারা হারাল তখন স্বভাবতই প্রশ্নের জন্ম হলো- এখন তারা কী করবে? তারা না পারছে আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশের হুকুম গ্রহণ করে নিতে, আবার না পারছে ব্রিটিশের হুকুম প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে। মুসলমানরা দেখল ব্রিটিশরা কেবল নতুন একটি শাসনব্যবস্থাই নয়, নতুন একটি সভ্যতাও চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। ফলে জীবনের প্রতিটি পদে পদে তাদেরকে হোঁচট খেতে হয়েছে যে, এটা গ্রহণ করব কিনা, এটা ইসলামসম্মত হবে কিনা, এই পোশাক পরব কিনা, এই খাবার খাব কিনা, এই চাকরি করব কিনা, এই ভাষায় কথা বলব কিনা ইত্যাদি। শুধু 'ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা হবে কিনা' এই দ্বিধার জন্য মুসলিমদেরকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল এ কথা ইতিহাস।

যাহোক, প্রায় তিনশ' বছর ইউরোপীয়দের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়ার পর একটি সময় এলো যখন পৃথিবীময় স্বাধীনতার দাবিতে একটার পর একটা আন্দোলন সৃষ্টি হতে লাগল। তুরস্ক, মিশর, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ খেলে গেল। ভারতবর্ষেও গড়ে উঠল অনেকগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। আমাদের এই বাংলাদেশের জন্মই হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার ভিত্তিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা তাদের স্ব স্ব ভূখণ্ডগুলির জনগণকে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে লাগলেন। লক্ষণীয় যে, এই নেতারা কিন্তু ইসলামের চেতনার উপর নির্ভর করতে পারলেন না। কারণ তারা দেখলেন যে ইসলামের সঠিক কোনো রূপরেখা কোথাও নেই। হাজারো দল-উপদল, ফেরকা-মাজহাব, তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেছে মুসলিম জাতি। তাদের একেক ভাগের আকীদা একেক রকম। লক্ষ্যের ঐক্য নেই, কর্মসূচির ঐক্য নেই। আর বৃহত্তর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ধর্মের প্রশ্নে স্থবির, অন্তর্মুখী মনোভাব লালন করে। তাদের দিয়ে আর যাই হোক কোনো শক্তিশালী অপশক্তিকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। অতএব জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর কোথাও ভাষাকে ব্যবহার করা হলো, কোথাও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধের চেতনাকে ব্যবহার করা হলো। এভাবে পৃথিবীর বহু ভূখণ্ড স্বাধীনতা লাভ করল। সেই ভূখণ্ডগুলোতে স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠিত হলো, নতুন সংবিধান প্রণিত হলো। আর এই সংবিধানগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে কোথাও বেছে নেওয়া হলো ধর্মহীন সমাজতন্ত্র, কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ইত্যাদি। ধর্ম যে অপাংক্তেয় ছিল, তাই রয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন এই মতবাদগুলোর ভিত্তিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোয় এই যে সংবিধান প্রণিত হলো, সেই সংবিধান মোতাবেক গড়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রকাঠামো। আইন-প্রনয়নের জন্য সংসদ তৈরি হলো, আইন প্রয়োগের জন্য বিচারালয় তৈরি হলো, আইন রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী গঠিত হলো। প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীও তৈরি হলো। এক কথায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই চালু হলো ধর্মকে বাদ দিয়েই।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঘরে ঘরে রইল কোর'আন, হাদীস, ফিকাহ ও ইতিহাসের বই। কোর'আনের অনুবাদ সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। কোর'আনের সেই আয়াতগুলোর কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যেগুলো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায়, এই আয়াতগুলোর বাস্তবায়ন বর্তমান সময়ে কীভাবে হবে, নাকি সেগুলোকে পরিত্যক্ত বলে গণ্য করা হবে এইসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কেউ পেল না। হাদীসে-সিরাতে বিশ্বনবীর রাষ্ট্রশাসনের যে দৃষ্টান্তগুলো রয়েছে যেগুলো মুসলিম জাতির জন্য পালনীয়- সেসবের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সে প্রশ্নেরও কোনো সমাধান হলো না। আবার ইউরোপীয়রা আসার পূর্বে মুসলিমরা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে যে রাষ্ট্রকাঠামো অনুযায়ী শাসন করেছে, যে হুকুমগুলোকে আল্লাহর হুকুম বলে মান্য করাকে ঈমানী কর্তব্য মনে করেছে, কাজীরা আদালতে যে রায় দিয়েছেন, ফকিহরা কোর'আন-হাদীসের বিশ্লেষণ করে যে আইন তৈরি করেছেন, মুফতিরা যে ফতোয়া দিয়েছেন- সেই সবকিছুই কিন্তু গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজও মাদ্রাসাগুলোতে লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে সেগুলো পড়ানো হচ্ছে, সেগুলোর

উপর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। সেগুলো পড়েই মাদ্রাসা থেকে বের হচ্ছেন আলেম, মুফতি, ফকিহরা যাদেরকে মানুষ ইসলামের কর্তৃপক্ষ মনে করে। এই ফকিহ-মুফতিদের কাছে যখন মানুষ ইসলাম শিখতে যাচ্ছে তখন তারা অতীতের ঐ ফতোয়ার কিতাবগুলো থেকেই ফতোয়া দিচ্ছেন। এখানে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে মানদণ্ডে। এমন একটি কাজ যা হয়ত ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অন্যায়, কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে তাকে অন্যায় মনে করা হচ্ছে না, কিংবা ইসলামের দৃষ্টিতে সেই অপরাধের শাস্তি একরকম, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে ভিন্নরকম- সে ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ কার কথা শুনবে? আজকে আমরা যে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি সেই জঙ্গিবাদকে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্মূল করতে সমর্থ হব না যতক্ষণ না এই প্রশ্নের সমাধান হয়। এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট সমাধান যদি করা যায় তাহলে অনেক জটিল প্রশ্নের সহজ জবাব মিলে যাবে, অনেক সঙ্কটের মীমাংসা আপনা থেকেই হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আপনারা এমন একটি জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যাদের কাছে অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ কোর'আন আছে। তারা আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে, প্রতিটি কাজকে কোর'আন-হাদীস খুলে যাচাই করবে। আবার ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞারও উপায় নেই। অবজ্ঞা করলে সেই ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মব্যবসায়ীরা লুফে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। তাহলে কী করবেন?

আজকে আমরা দেখি সরকারকে, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাগুত, মুরতাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন রাস্তায় চেষ্টা করছে। কেউ ইসলামের নামে রাজনীতিতে নেমেছে, কেউ আবার জিহাদের নামে সশস্ত্র উপায়ে চেষ্টা করছে। এর মাঝামাঝিও কিছু গ্রুপ আছে, যারা বিভিন্ন সময় ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের কথা বলে রাজপথে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ইত্যাদি করেন। এই গ্রুপগুলোর নিজেদের মধ্যে হাজারো মতভেদ থাকলেও একটি ব্যাপারে তারা সবাই একমত যে, তারা রাষ্ট্রে কোর'আন-হাদীসের হুকুম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান। আর তা করতে গিয়েই তারা কেউ রাজনীতি করেন, কেউ আন্দোলন করেন, কেউবা সশস্ত্র হামলা করেন। কিন্তু তারা এই সহজ সত্যটি বোঝেন না যে, তারা একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিক, যে দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত সংবিধান আছে, বিচারালয় আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, সেনাবাহিনী আছে। কাজেই তারা এখানে এমন কোনো কর্মকাণ্ড করতে পারেন না যেটা প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের বিরুদ্ধে যায়, প্রচলিত আইনে যেটা কিনা অপরাধ। তারা এখন কেবল সেটাই করতে পারেন যেটা আল্লাহর রসুল করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে যাবতীয় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা। তারপর মানুষ সিদ্ধান্ত নিবে তারা আল্লাহর হুকুম মানবে কিনা। যদি মানতে চায় তবে আজকে তারা যে রাষ্ট্রপরিচালকদেরকে তাগুত-মুরতাদ ইত্যাদি বলছেন হয়ত তারাই কালকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দেশ শাসন করবেন। মূল কথা হচ্ছে মানুষ সেটা চায় কিনা। যারা ইসলামের জন্য সত্যিকার অর্থেই কিছু করতে চান তাদের উচিত হবে মানুষের সামনে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। আর যারা রাষ্ট্রচালনা করছেন তাদেরকে ভাবতে হবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে ধর্মকে তারা কী করবেন। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে মুছে ফেলা যায় না, অতীতে অনেক প্রচেষ্টা করেও লাভ হয় নি। আবার ধর্মকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন? তারও উপায় নেই। মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে। আপনারা একটি ধর্মবিশ্বাসী জাতির নেতা। আপনারা এমন একটি জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যাদের কাছে অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ কোর'আন আছে। তারা আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে, প্রতিটি কাজকে কোর'আন-হাদীস খুলে যাচাই করবে। আবার ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞারও উপায় নেই। অবজ্ঞা করলে সেই ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মব্যবসায়ীরা লুফে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। তাহলে কী করবেন? করণীয় একটাই- ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে এবং সেই শিক্ষার উপরে নিজেরাও দণ্ডায়মান থাকতে হবে। জাতিটাকে যাবতীয় ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসী জনগণের সামনে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলতে হবে, তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় বিভেদ-বিসম্বাদকে ব্যক্তিগত জীবনেই রেখে দিয়ে জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে, বাঁচা-মরার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হও। ঐক্যের চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নেই। আল্লাহর রসুল বলেছেন ঐক্য ভঙ্গ কর কুফর। কাজেই আগে তো ঐক্যবদ্ধ হই। আগে তো জীবন বাঁচাই।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র চিঠির জবাবে কাজী নজরুল ইসলাম

টাঙ্গাইলের করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেব নজরুলকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠির জবাব হিসেবে নজরুল যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে একটি অংশ পাঠকদের জন্য নিচে তুলে ধরা হল,

"আপনি সমাজকে 'পতিত, দয়ার পাত্র' বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি- কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্ব্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্ত আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন ? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে ওঠার কথা। কিন্ত বেচারী অবিশ্বাসী অস্ত্র-চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে অস্ত্র; রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্ত্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা ক'রে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্ত অস্ত্র চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাঁদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র সইবার মত পেট, আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে "তাজা - ব-তাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজো বলছি- সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্ত দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী-তাঁরই আগমণী-গান। আমি তারই অগ্রপথিক তূর্য্যবাদক। আমার মনে হয় সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে চলেছি- জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেওয়া তূর্য্য বাজিয়ে চলেছি। এ-বিশ্বাস কোথা হ'তে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয় কার যেন আদেশ-কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও উর্দ্ধে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ কথা বলতেও আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনো মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাকে ধরতে পারি।

আপনার "হাত বাড়াবে কি?" কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি-যার ধ্যান-লোকে বসে আমি তপস্যা-প্রজ্জোলনেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই-আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সে-দিন।"

(খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন বিরচিত যুগ-স্রষ্টা নজরুল গন্থ থেকে সংগৃহীত)

ধর্মনেতারাই যখন ধর্মের প্রতিবন্ধকতা

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইসলামবিদ্বেষীরা চায় ইতিহাসকে এমনভাবে বর্ণনা করতে যাতে ধর্মকে খুব সহজে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। তাই প্রকৃত ধর্মের ইতিহাস নিয়ে তারা খুব কমই কথা বলেন, সেটার বদলে তারা বিকৃত ধর্ম ও তার অপপ্রয়োগের দিকগুলোকেই ধর্মের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে চান, যাতে মানুষ কেবল ধর্মের অপব্যবহারের কথাই বেশি বেশি শোনে ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে থাকে। তেমনি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যেও যে ধর্মবেত্তা পুরোহিত শ্রেণিটি রয়েছে তারা চায় যে কোনো পন্থায় ইতিহাস থেকে পুরোহিত শ্রেণিটির অপকর্মগুলোকে মুছে ফেলতে এবং ইতিহাসকে এমনভাবে বর্ণনা করতে যেন আলেম-পুরোহিত শ্রেণিটিকে ধর্মের একেবারে অনিবার্য অংশ বলে মনে হয়। অর্থাৎ যার যার স্বার্থ অনুযায়ী তারা ইতিহাসের নির্দিষ্ট পাতায় আলো ফেলেন মাত্র, বাকিটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তার আড়ালেই রয়ে যায়।

আমরা দেখি ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, ধর্মসভা ইত্যাদিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মের ইতিহাস ও নবী-রসুলদের জীবনী আলোচনা করা হয়, কিন্তু যে কথাগুলো ভুলেও উচ্চারণ করা হয় না তা হচ্ছে- আখেরী নবীর প্রধান শত্রু আবু জাহেল তৎকালীন সমাজের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিল। মুসা (আ.) এর বিরোধিতাকারী ফেরাউন কেবল রাষ্ট্রনেতাই ছিল না, ধর্মনেতাও ছিল। ঈসা (আ.) এর সাথে শত্রুতা করেছিল তৎকালীন ইহুদি ধর্মগুরু রাব্বাই ও ফরিসিরা এবং মূলত তাদের দাবিতেই ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। ইউসুফ (আ.) এর প্রধান শত্রু ছিল মিশরের ধর্মীয় পুরোহিতরা, যারা মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে বারবার ইউসুফ (আ.) কে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে। বনি ইজরাইলের অনেক নবীকে জীবন দিতে হয়েছিল জাতিটির ধর্মীয় নেতাদের হাতেই। সঙ্গত কারণেই এই বিষয়গুলো আজকের পুরোহিত আলেম সমাজ সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে চান, ফলে ধর্মের ইতিহাসে পুরোহিততন্ত্রের অবদান যে ইতিবাচক নয় ঘোর নেতিবাচক সে সত্যটি সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জানতেও পারে না, সচেতনও হতে পারে না।

আমরা দেখি ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, ধর্মসভা ইত্যাদিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মের ইতিহাস ও নবী-রসুলদের জীবনী আলোচনা করা হয়, কিন্তু যে কথাগুলো ভুলেও উচ্চারণ করা হয় না তা হচ্ছে- আখেরী নবীর প্রধান শত্রু আবু জাহেল তৎকালীন সমাজের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিল। মুসা (আ.) এর বিরোধিতাকারী ফেরাউন কেবল রাষ্ট্রনেতাই ছিল না, ধর্মনেতাও ছিল। ঈসা (আ.) এর সাথে শত্রুতা করেছিল তৎকালীন ইহুদি ধর্মগুরু রাব্বাই ও ফরিসিরা এবং মূলত তাদের দাবিতেই ঈসা (আ.) কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।

ইতিহাস এই যে, একজন নবী হয়ত অক্লান্ত সংগ্রামের মাধ্যমে কোথাও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষ অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত থেকে রেহাই পেল, জীবনে শান্তি নেমে এল। নবী তার জাতিকে সাবধান করে দিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দীনকে পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যবহার করবে না। কিন্তু নবী চলে যাবার পর সেই জাতির মধ্যে গজিয়ে উঠল একদল পুরোহিত শ্রেণি যাদের কথাই হয়ে উঠল ধর্মের আইন, বিধান। এরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে লাগল, এমনকি নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ঠিক রাখতে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠিত হলো না। সাধারণ মানুষ তাদেরকে ধর্মের একচ্ছত্র কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে তাদের মনগড়া বক্তব্যকে মেনে চলতে লাগল। কেউ যাচাই করল না তারা সত্য বলছে কিনা, সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত করে দিচ্ছে কিনা, এক কথায় অন্ধ অনুসরণ করতে লাগল। এদের ব্যাপারে কোর'আনে আল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে (সুরা তাওবা: ৩১) অর্থাৎ

তাদের আলেমরা যা হালাল করেছে তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। স্বভাবতই তার পরিণতিতে ধর্মে একটু একটু করে বিকৃতি প্রবেশ করতে লাগল। একটা সময় এসে সেই ধর্ম আর শান্তি দেওয়ার মত অবস্থায় থাকল না। ধর্মই হয়ে উঠল অধর্মের কল। তখন আল্লাহ পূর্বের ঐ নবীর আনিত দীনকে সংশোধন করার জন্য নতুন আরেকজন নবী পাঠালেন। সেই নবী এসে বললেন, 'আমি আল্লাহর মনোনীত রসুল। তোমরা যে নবীর আনিত দীনের অনুসরণ করছো সেই নবীকে আমি সত্যায়ন করছি, তার দীনকেও সত্যায়ন করছি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তোমাদের নবীর আনিত দীনকে তোমরা বিকৃত করে ফেলেছো। এটা আর নবীর আনিত সেই সত্যদীন নেই। কাজেই আমি তোমাদেরকে যেই দীন দিচ্ছি সেটা গ্রহণ করে নাও আর আমাকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দাও।' নবীর এই কথাকে আগের দীনের আলেম পুরোহিত শ্রেণিটি কখনই স্বীকার করে নাই, প্রয়োজনে তারা নবী-রসুলদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। কারণ এই কথা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তাদের জ্ঞানের অহংকার, সামাজিক মর্যাদা-প্রতিপত্তি, সুযোগ সুবিধা সবকিছু চূর্ণ হয়ে যাওয়া। আবার এমনও হয়েছে, নতুন নবীর প্রতি কিছু লোক ঈমান এনেছে ও তাঁর আনিত দীনকে নিজেদের জীবনে কার্যকরী করেছে, আর বাকিরা ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতদের অন্ধ অনুসরণ করে পূর্বের বিকৃত দীনেই থেকে গেছে। এভাবে একটিমাত্র জাতির মধ্যে নতুন জাতির পত্তন হয়েছে, নতুন দীনের নামকরণ হয়েছে। যেমন ঈসা (আ.) এসেছিলেন মুসা (আ.) এর উম্মত দাবিদার ইহুদিদের দীনকে সংশোধন করে পুনরায় তাদেরকে সঠিক পথে ওঠাতে। কিন্তু ইহুদি ধর্মীয় নেতারা অর্থাৎ রাব্বাই ফরিসিরা প্রবল বিরোধিতা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ.) কে হত্যার চেষ্টা করল। ঈসা (আ.) কে আল্লাহ উঠিয়ে নেওয়ার পরে তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীরা বনি ইজরাইলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ইউরোপে ঈসা (আ.) এর শিক্ষা প্রচার করতে লাগলেন এবং সেখানে তা 'খ্রিস্টধর্ম' নামে গৃহীত হয়ে গেল। জন্ম হলো আরেকটি নতুন ধর্মের। একই ধরনের ঘটনা আমরা পাই মহামতি বুদ্ধের জীবনে। তাকেও পূর্বের ধর্মাদর্শের পুরোহিত শ্রেণিটির প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় এবং তাদের বিরোধিতার কারণেই সনাতন ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম নামের নতুন একটি ধর্মের জন্ম হয়। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'বুদ্ধদেব এর শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহুদি ধর্মের সহিত খ্রিষ্টানধর্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখ্রিস্ট ইহুদি ছিলেন ও শাক্যমুনি (বুদ্ধদেব) হিন্দু ছিলেন। শাক্যমুনি নতুন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মতো তিনিও (পূর্ব ধর্মমতকে) পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। [১৮৯৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা]।

বস্তুত সকল ধর্মেই একটা সময় পুরোহিত শ্রেণিটি গজিয়েছে এবং যখনই তাদের মধ্যে কেউ মহাসত্য নিয়ে আবির্ভুত হয়েছে, তাদের বিকৃতিগুলো সংশোধন করতে চেয়েছে, তখন এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি তাদের কায়েমী স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখতে নির্লজ্জভাবে সত্যের বিরোধিতা করেছে এবং ফলশ্রুতিতে জাতির মধ্যে এসেছে বিভক্তি, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। পুরোহিততন্ত্রের এই অভিশাপ কেবল ইতিহাসকেই নয়, বর্তমানকেও কলঙ্কিত করে চলেছে। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যেখানেই ধর্ম কোনো বিশেষ শ্রেণির পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের পথে ব্যবহৃত হবে সেখানেই ধর্মের নামে অধর্ম হতে থাকবে, প্রকৃত ধর্ম উদ্ভাসিত হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং বর্তমানে সেটাই হয়েছে।

আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত ও ধর্মীয় উগ্রপন্থা মহামারীর ন্যায় পৃথিবীকে গ্রাস করে চলেছে তখন কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর অশেষ কৃপায় প্রকৃত ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং মানবজাতিকে সেই সত্যের দিকে আহ্বান জানান তাহলে তার কী পরিণতি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিশ্চিতভাবেই তাকে ধর্মব্যবসায়ী আলেম-পুরোহিতদের রোষানলে পড়তে হবে এবং তাদেরও রোষানলে পড়তে হবে যারা ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের যুক্তি বুদ্ধি উপলব্ধির শক্তি কাজে লাগিয়ে কোনোকিছু যাচাই করার সামর্থ্য তাদের নেই।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

দ্বিধাগ্রস্ত ও শতধাবিভক্ত সমাজ প্রগতির অন্তরায়

মোহাম্মদ আসাদ আলী

পশ্চিমাদের ন্যায় আমাদের সমাজেও ধর্মকে পরিকল্পিতভাবে উপাসনাকেন্দ্রিক করে ফেলার জোর চেষ্টা চালানো হয়েছে, ধর্মকে মসজিদ-মন্দিরের মধ্যে, ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ধর্মের শিক্ষা দ্বারা সমাজ পরিচালিত হলেও বর্তমানে ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে ধর্ম এসেছে মানুষের কল্যাণে তা এখন কেবলই ধর্মব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার আর পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষিত শ্রেণিটির কাছে কাল্পনিক জুজুর ভয়।

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আমাদের উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, তার প্রভাবে ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে আস্থাহীন ধর্মচর্চার রশিতে ঝুলে আছে সন্দেহবাদী শিক্ষিত সমাজ। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামমাত্র। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। কৌশল করে ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা বইতে যতটুকু ধর্ম শেখানো হয়েছে তার পুরোটাই ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়। সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আদিকালের পুরাতন স্রষ্টার আধুনিক জীবনের জটিলতার সমাধান করার মতো জ্ঞান নেই (নাউজুবিল্লাহ), তাই এ বিষয়ে তিনি নীরব। মানুষের মনকে ধর্মবিমুখ ও অবজ্ঞাপ্রবণ করে তোলার এটি হচ্ছে একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। ধর্ম বলছে- সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়াকে পৃথিবীতে প্রেরণের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদেরকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে বসবাসের সমস্ত জ্ঞান দান করেন, ভাষা শিক্ষা দেন এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করেন ও সন্তানের জন্ম দেন। অর্থাৎ মানবসৃষ্টির শুরুতেই মানুষ পরিবার গঠন করলো, আস্তে আস্তে সমাজ হলো।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষাসহ অন্যান্য বইগুলোতে বলা হচ্ছে- বানর জাতীয় প্রাণীর বিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি (এখানে সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত)। মানুষ প্রথমে কথা বলতে জানতো না (যেহেতু স্রষ্টাই নেই, বানর থেকে তার সৃষ্টি কাজেই ভাষা জানবে না এটাই স্বাভাবিক, শেখানোর তো কেউ নেই) ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে, নৃত্যের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। আস্তে আস্তে সে ভাষা আবিষ্কার করল। তারা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করত, একসময় তারা একসাথে বসবাস শুরু করল। তারা পোশাক পরতে জানত না, পোশাক পরা শিখল। পশু শিকার করে খেত, একসময় কোনো বুদ্ধিমতী নারী সুস্বাদু ফল খেয়ে বীজ মাটিতে বপন করল, সেখান থেকে গাছ হলো, ফল ধরল, এখান থেকে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করল। এভাবে নারীদের মাধ্যমে কৃষিকাজের সূচনা হলো। এরপর নারীরা তার পছন্দমতো পুরুষ সঙ্গী বেছে নিয়ে একসাথে বসবাস শুরু করল- এভাবে শুরু হলো পারিবারিক জীবন (অতি সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করেছি)।

এই জ্ঞানগুলো সমাজবিজ্ঞানীরা কোথায় পেল আমার জানা নেই। আসলে তাদের এই মস্তিষ্কপ্রসূত বানোয়াট কথাগুলো জ্ঞান হিসাবে পাঠ্য বইয়ে দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য- শিক্ষিত সমাজকে ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহবাদী করে তোলা। যখন ইউরোপীয় সেক্যুলারিজমের জন্ম হয়েছে তখন থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং অনেকাংশেই তারা সফলও হয়েছে। যারা শিক্ষিত হচ্ছে তারা এই জ্ঞানগুলোই সত্য বলে মেনে নিচ্ছে, এ বিষয়গুলোতে কারও দ্বিমত করতেও দেখি না।

এখন মানুষ যদি ধর্মকে সত্য বলে জানে তবে তার অন্যান্য বইয়ে পড়া সব জ্ঞানকে মিথ্যা বলে জানতে হচ্ছে আর যদি অন্য সব জ্ঞানকে সত্য বলে জানে তবে ধর্মকে মিথ্যা বলে জানতে হচ্ছে। এ কারণে মানুষ বিশ্বাসগতভাবে দুইটা মেরুতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিচ্ছে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে।

এখন প্রয়োজন- সকল বইয়ের মধ্যে সত্য বিষয়টা তুলে ধরা, মিথ্যা, বানোয়াট বিষয়গুলো বাদ দেওয়া, অপরপক্ষে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী না রেখে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মের বক্তব্যগুলো যৌক্তিকভাবে (যুক্তিগুলো আমাদের কাছে আছে), বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করতে হবে, ধর্মকে ব্যবসায়িক হাতিয়ারে পরিণত হতে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্র ও ধর্মকে একমুখী করতে হবে। না হলে দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত সমাজ নিয়ে খুব বেশিদূর এগুনো সম্ভব হবে না।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

একটি স্বার্থপরতার গল্প

রাকীব আল হাসান

একবার এক ইঁদুর লক্ষ্য করল যে বাড়িতে ইঁদুর মারার ফাঁদ পাতা রয়েছে। সে খুবই ভয় পেল। ফাঁদটি অকেজো করার জন্য সে ওই বাড়িতে থাকা মুরগির সাহায্য চাইল। মুরগি ঘটনা শুনে জবাব দিল- "ফাঁদটি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব আমি এখানে কোন সাহায্য করতে পারব না"।

মুরগির কাছ থেকে এই উত্তর শুনে ইঁদুর খুব দুঃখিত হলো এবং ছাগলের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইল। ছাগল ফাঁদের কথা শুনে বললো- "ওই ফাঁদ বড়দের জন্য নয়। আমি এখানে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না"।

ইঁদুর ছাগলের কাছ থেকে একই উত্তর শুনে দুঃখিত হয়ে গরুর কাছে এলো। সব কথা শুনে গরু বললো- "ইদুরের ফাঁদ আমার মতো বড় প্রাণীর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। যা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তা নিয়ে আমি কেন বৃথা চিন্তা করব?"। ইঁদুর শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তার ঘরে ফিরে এলো।

রাতের বেলা বাড়ির কর্ত্রী অন্ধকারের ভিতর বুঝতে পারলেন যে ফাঁদে কিছু একটা ধরা পরেছে। অন্ধকারে ফাঁদের কাছে হাত দিতেই উনি হাতে কামড় খেলেন এবং দেখলেন ফাঁদে ইঁদুরের বদলে সাপ ধরা পড়েছে। তার চিৎকারে কর্তার ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হলো। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অবস্থা মোটেই ভালো না। পথ্য হিসেবে ডাক্তার মুরগির সুপ খাওয়াতে বল্লেন। সুপের জন্য কর্তা মুরগিকে জবাই করে দিলেন। অবস্থা আস্তে আস্তে আরও খারাপ হতে লাগলো। দূর দূরান্ত থেকে আরও অনেকে আত্মীয় স্বজন আসতে লাগলো। বাধ্য হয়ে কর্তা ছাগলকে জবাই করলেন তাদের আপ্যায়ন করার জন্য। আরও ভালো চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার হতে লাগলো। অবশেষে বাড়ির কর্তা তাদের গরুটিকে কসাইখানায় বিক্রি করে দিল। একসময় বাড়ির কর্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠল। আর এই সমস্ত কিছু ইঁদুরটি তার ছোট্ট ঘর থেকে পর্যবেক্ষণ করল।

আমাদের দেশ এখন জঙ্গিবাদ দ্বারা আক্রান্ত। প্রথমে ব্লগার হত্যা দিয়ে শুরু হয়ে প্রকাশক, পুরোহিত, শিয়া, বিদেশি নাগরিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬ সালে চাঞ্চল্যকর গুলশান হামলা ও শোলাকিয়া ঈদের জামাতে হামলার মাধ্যমে দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ ইস্যুটি ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। এই ইস্যুটি নিয়ে আমরা দীর্ঘ চার বছর কাজ করেছি। গুলশান হামলার পর থেকে আমরা দেশব্যাপী বহু সভা-সমাবেশ, র‍্যালি ও মানববন্ধন করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে যখন আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে বলেছি যে, জঙ্গিবাদ আমাদের সকলের জন্য এক মহা সঙ্কট, আসুন আমরা এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলি, তখন অনেকেই বলেছেন- এটা আমাদের কোনো সমস্যা নয়, তারা তো আমাদেরকে মারে না, তারা নাস্তিকদের মারে, বিদেশিদের মারে, সরকারের বিরোধিতা করে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ। শুধু শুধু এই সব ঝামেলার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে জড়াব কেন? যারা স্বার্থপরের মতো এই চিন্তায় ঘরে বসে আছেন যে আপনার উপর কোনো হামলা তো হয়নি তাদের পরিণতি উপরোক্ত গল্পের ওই মুরগি, ছাগল আর গরুর মতোই হবে। ইরাক-সিরিয়াতে যখন জঙ্গিবাদের উত্থান হচ্ছিল তখন তারাও ভেবেছিল এটা আসাদ সরকারের সমস্যা, এতে আমার তো কোনো সমস্যা নেই। এখন সেই সাধারণ মানুষ উদ্বাস্তু, লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সমুদ্রে ডুবে মারা যাচ্ছে, ইউরোপের ফুটপাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে তাদের বাস্তুভিটা, ধ্বংস হয়ে গেছে ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, ক্ষেত-খামার সবকিছু। তারা যদি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারত তবে তাদের এই করুণ পরিণতি ভোগ হয়ত করতে হতো না।

আমাদের কথা হলো- আমাদের দেশকে আমরা ইরাক-সিরিয়া হতে দিতে পারি না, জঙ্গিবাদ নামক এই বৈশ্বিক সঙ্কট আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেবে আমরা সেটা হতে দেব না ইনশাল্লাহ। আপনারা স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠুন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামুন। একদিকে যেমন মুসলিম হিসাবে এটা আপনার ঈমানী কর্তব্য অন্য দিকে দেশ প্রেমিক হিসাবে এটা আপনার সামাজিক দায়িত্বও।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

সুদের চোরাবালি

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আমাদের জন্য আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এ কথা প্রতিটি ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট। সমাজে আমরা সুদ শব্দটি ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করলেও আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে সুদ মিশে রয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সুদ। কিন্তু এ সুদের মধ্যে যে ঘৃণা ও অপবিত্রতা লিপ্ত রয়েছে তার থেকে রক্ষার জন্য বর্তমান মুসলিম জনগোষ্ঠী সুদের বিভিন্ন নাম ব্যবহার করছে। শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠীই নয় অন্যান্য সকল ধর্মের মানুষের কাছেই সুদ ঘৃণিত এবং অন্যান্য সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ। তবুও তারাও একইরূপে সুদকে প্রতারণামূলক ভাষার মোড়কে পুরে ব্যবহার করছে। যেমন ইংরেজিতে Usury শব্দটির বদলে Interest বেশি প্রচলিত, বাংলাতে সুদের বদলে লাভ, মুনাফা, মুদারাবা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ভাষাভেদে হারাম কখনও হালাল হয়ে যায় না।

এই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে একটি জাতির সকল সম্পত্তি এক জায়গায় স্তূপীকৃত হয় ও এর ফলে বিশাল এলাকায় অর্থনৈতিক শূন্যতাও দেখা যায়। আজকের এই ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গুটিকয়েক পুঁজিপতি রাষ্ট্রের সিংহভাগ অর্থ সম্পদ দখল করে রাখার ফলে তারা আজ জঘন্য বিলাসিতায় মগ্ন ও অপরদিকে সাধারণ জনগণের বিরাট অংশ এখনও মৌলিক চাহিদাটুকুও পূরণ করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সুদভিত্তিক ব্যবস্থার মূলই হলো এর মাধ্যমে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়। এই ব্যবস্থা যদি ১০ জন ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে তাদের মধ্যেও অর্থনৈতিক অবিচার সৃষ্টি হবে। তেমনি কোন দেশে সুদ প্রতিষ্ঠিত হলে সে দেশেও কিছু লোক ধনকুবেরে পরিণত হবে আর অধিকাংশ লোক শোষিত হবে। এই ব্যবস্থা যদি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে কিছু রাষ্ট্র দুনিয়ার তাবত সম্পদের মালিকানা পেয়ে যাবে আর বাকি দুনিয়া তাদের দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে রাখবে। আজ ঠিক তাই ঘটেছে। আজ সার বিশ্বে অর্থনৈতিক শোষণ ও ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন।

মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে লোকসংখ্যা ও রাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে। এরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই এর কোনটির একক সমাধান সম্ভব নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য। ইসলামে যেমন সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখা নিষিদ্ধ, তেমনি নিষিদ্ধ ভৌগোলিক সীমারেখা টেনে জনসংখ্যার জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করা। আল্লাহর উভয় বিধানকে আজ অস্বীকার করার ফলে মানবজাতি অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আল্লাহ এ কারণেই ভৌগলিক ও জাতীয় বিভাজন নিষিদ্ধ করেছেন যাতে জনসংখ্যা একজায়গায় পুঞ্জিভূত না থাকে। তেমনি অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে সম্পদকে একটি নির্দিষ্ট একভূত না করে অবিশ্রান্তভাবে সারা পৃথিবীতে ঘূর্ণায়মান রাখার (Fast circulating) নির্দেশ দিয়েছেন। একটি উদাহারণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাবে। এক বালতি পানি মাটিতে (পৃথিবীতে) ঢেলে দিলে ঐ পানি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই যেখানে গর্ত (দারিদ্র্য) থাকবে সেটা ভরে দেবে, যেখানে উঁচু (সমৃদ্ধি) থাকবে সেখানে যাবে না এবং ঐ পানি নিজে থেকেই তার সমতল খুঁজে নেবে। ঐ বালতির পানি হলো জনসংখ্যা ও সম্পদ। আমরা যদি আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ না করি তবে আমাদের দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের ব্যবধান দূর হবে না, আর যতদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একজাতি না হতে পারবো ততদিন আমাদের পৃথিবীতে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ ও রক্তপাত (ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা) বন্ধ হয়ে শান্তি আসবে না।

কোর'আন ও হাদীসে সুদঃ

আসুন আমরা পবিত্র কোর'আন থেকে সুদ সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি। আল্লাহর কোর'আনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে আল্লাহ যে কোন বিষয় আদেশ বা নিষেধ করলে সে বিষয়ে যুক্তি প্রদান করেন। সুদ হারাম করার বিষয়টিও এমন। আল্লাহ বলেন:

- যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মত।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর

ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে (সুরা বাকারা-২৭৫)।

- আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না (সুরা বাকারা ২৭৬)।
- হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মো'মেন হও (সুরা বাকারা ২৭৮)।
- যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহও তাঁহার রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহার মাধ্যমে তোমরা অন্যায়, জুলুম করবে না এবং নিজেরাও অন্যায়ের শিকার হবে না (সুরা বাকারা ২৭৯)।

পবিত্র কোরআনের নির্দেশনার আলোকে রসুলাল্লাহ লানত করেছেন যে- সুদ খায় তাহার প্রতি, যে সুদ দেয় তাহার প্রতি, যে সুদের দলিল লেখে তাহার প্রতি, যে দুইজন সুদখোরের সাক্ষী হয় তাহার প্রতি। রাসুলাল্লাহ ইহাও বলেছেন যে, তারা সকলেই সমান [জাবের রাঃ থেকে মুসলিম, মেশকাত]।

মেরাজের রাত্রে রসুলাল্লাহ (স.) কতগুলো লোককে দেখেন যে, তাদের পেট বড় বড় ঘরের মত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই লোকগুলো কারা? বলা হয়- এরা সুদখোর।' রাসুলাল্লাহ (স.) বলেছেন: যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছাই যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, কয়েকটি লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন মালায়েক অনেক পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাদের মুখ ফেড়ে এক একটি পাথর ভরে দিচ্ছেন। তারপর লোকগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তারা সুদখোরের দল। তাদের এই শাস্তির কারণ এই যে, তারা বলতো সুদ ব্যবসায়ের মতই। তাদের এই প্রতিবাদ ছিল শরীয়তের ওপর এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর। তারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের মত হালাল মনে করতো (বোখারী)।

তারপর বলা হচ্ছে- আল্লাহর উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সব পাপ মার্জনা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ সে পূর্বে যা করেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন (সুরা আল মায়েদা, আয়াত নং ৯৫)।

অতঃপর আল্লাহ বলেন- 'সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে জাহান্নামে অবস্থান করবে।' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলো না, সে যেন আল্লাহও তাঁর রসুলের (সা.) সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ কর এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে (মুসনাদ-ই-আহমাদ)।

এখন কথা হল আমরা বর্তমানে যে ধর্মগুলি পালন করে যাচ্ছি তা ব্যক্তিগত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে সুদ বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শুধু বৈধই নয় বরং ইচ্ছা-অনিচ্ছায়ও সুদের সাথে অনেককে জড়িত হতে হচ্ছে। আমরা যে গাড়িতে চড়ছি, যে রাস্তায় হাটছি, যে পোশাক পড়ছি সেগুলো প্রতিটির সাথে সুদের সম্পর্ক রয়েছে।

ইসলামের মূল বাণী হচ্ছে আমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ হবো যে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমদাতা মানবো না। এই অঙ্গীকার জীবনের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সর্ব অঙ্গনের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সর্বস্তরের যেখানে যেখানে আল্লাহর বক্তব্য রয়েছে সেখানে আর কারও বক্তব্য মানবো না। এটাই তওহীদের মূল কথা। এই তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহকে হুকুমদাতা থেকে বাদ দিয়ে যদি সেখানে মানুষের তৈরি নিয়মকানুন কে মেনে নিই তবে আমরা শেরকে লিপ্ত হবো যে পাপকে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না। শিরকে লিপ্ত হলে আমরা যতই নামাজ, রোজা করি না কেন সেইসবের আর কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং জীবন থেকে সুদকে পরিহার করতে হলে আমাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। এছাড়া আর কোনভাবেই এই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। আল্লাহর রসুল বলে গিয়েছেন, "এমন একটা সময় আসবে যখন সুদ সর্বব্যাপী হবে যে একটি লোকও সুদ খাওয়া থেকে রক্ষা পাবে না। কেউ সুদকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও সুদের ধূলা বা ধোঁয়া উড়ে এসে তাকে স্পর্শ করবে (আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ, মেশকাত)।"

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ ও কলামনিস্ট

কেতাব বহনকারী গর্দভ

রিয়াদুল হাসান

মানবজাতির ইতিহসে ধর্মজীবী আলেম পুরোহিত শ্রেণির জন্ম নতুন নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে যে দীনগুলো প্রতিষ্ঠিত তার কোনটিতেই এরকম কোন শ্রেণি সৃষ্টির অনুমতি আল্লাহ দেন নি। কিন্তু প্রতিটি দীনেই তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তারা প্রতিটি দীনেই গজিয়েছেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের তৈরি করেছেন এবং এর জন্য তারা প্রত্যেক দীনকেই , জীবনব্যবস্থাকেই নতুন ব্যখ্যা ও মতবাদের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছেন, গুরুত্বের (Priority) ওলোট-পালট করে ফেলেছেন এবং যার ফলে দীনগুলি হয়ে পড়েছে অর্থহীন। পূর্ববর্তী সকল ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, ইহুদি ইত্যাদি প্রত্যেক দীনের অবস্থা আজ একই রকম। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ প্রদত্ত শেষ দীন ইসলামেও এমন শ্রেণির অস্তিত্ব দেখা যায় যার উপস্থিতি এ শেষ দীনে কখনই ছিল না।

রসুলের ওফাতের ৬০-৭০ বছরের পর এ উম্মাহ তাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তারা প্রেরিত হয়েছিল সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত এ শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করে মানবজীবনে শান্তি, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু তারা রসুলের এ সুন্নাহ ত্যাগ করে রাজা বাদশাহদের মতো ভোগ বিলাস শুরু করে ও আলেম সমাজ এ দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। জাতিতে জন্ম নেয় পূর্ববর্তী অন্যান্য দীনের মতো ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণি। অন্যান্য দীন অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মের পুরোহিতদের সাথেও ইসলামের পুরোহিতদের মিল থাকলেও সবচেয় বেশি মিল দেখা যায় ইহুদি ধর্মের পুরোহিতদের সাথে। যেমন, বর্তমান ইসলামে পুরোহিত শ্রেণিদের মাওলানা বলে সম্বোধন করা হয় ও ইহুদিদের পুরোহিত শ্রেণিকে রাব্বাই বলে, যা উভয়ই একার্থবোধক। মাওলা শব্দের অর্থ প্রভু ও মাওলানা শব্দের অর্থ আমাদের প্রভু। একইভাবে রব থেকে রাব্বাই অর্থাৎ আমাদের প্রভু। আল্লাহর রসুল ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ.) তাঁর জাতিকে অর্থাৎ ইহুদিদের এ বিকৃতি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। একদিন এক অনুলেখক (scribe) ঈসাকে (আ:) তার গৃহে আমন্ত্রণ জানালে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, "I will come thither when thou wilt promise to call me Brother and not "Lord" and shalt say thou art my brother, and not my servant. (Gospel of Barnabas, Chapter 182, Page-493)." অর্থাৎ "আমাকে মওলানা, প্রভু ইত্যাদি বলে ডাকবে না, ভাই বলে ডাকবে, তাহলে আমি তোমার বাড়িতে যাবো।" অথচ তাঁর অনুসারী দাবিদার খ্রিষ্টানরা তাঁকে কেবল প্রভুই বলে না একেবারে আল্লাহর পুত্র বলে সাব্যস্ত করে।

ইহুদি ধর্মের রাব্বাইরা যেমন তাদের 'ধর্মীয়' জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড অহঙ্কারী তেমনি বিকৃত ইসলামের এই মওলানারাও তাই। ঐ 'ধর্মীয়' জ্ঞানের আত্মম্ভরিতার ফলে যুগে যুগে পুরোহিত শ্রেণিরা আল্লাহ থেকে আগত প্রকৃত দীনকে অস্বীকার করেছে। যেমন, ঈসা (আ.) কে রাব্বাইরা অস্বীকার করেছে, শেষ রসুলকে আবু জহল, উৎবা, শাইবা এরা অস্বীকার করেছিল জ্ঞানের অহংকারের ফলে। তেমনি বর্তমানেও যদি প্রকৃত ইসলামকে

ইহুদি ধর্মের রাব্বাইরা যেমন তাদের 'ধর্মীয়' জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড অহঙ্কারী তেমনি বিকৃত ইসলামের এই মওলানারাও তাই। ঐ 'ধর্মীয়' জ্ঞানের আত্মম্ভরিতার ফলে যুগে যুগে পুরোহিত শ্রেণিরা আল্লাহ থেকে আগত প্রকৃত দীনকে অস্বীকার করেছে। যেমন, ঈসা (আ.) কে রাব্বাইরা অস্বীকার করেছে, শেষ রসুলকে আবু জহল, উৎবা, শাইবা এরা অস্বীকার করেছিল জ্ঞানের অহংকারের ফলে। তেমনি বর্তমানেও যদি প্রকৃত ইসলামকে উপস্থাপন করা হয় তবে বর্তমানের মওলানা অর্থাৎ ধর্মজীবী পুরোহিতরা একে অস্বীকার করে, এর বিপরীতে প্রচণ্ড বাধা প্রদান করে।

উপস্থাপন করা হয় তবে বর্তমানের মওলানা অর্থাৎ ধর্মজীবী পুরোহিতরা একে অস্বীকার করে, এর বিপরীতে প্রচণ্ড বাধা প্রদান করে। আমরা যদি আমাদের রসুলের জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখবো তিনি সবচেয়ে বেশি বিরোধীতার শিকার হয়েছেন ইব্রাহীম (আ.) এর আনীত দীনে হানিফের বিকৃতরূপের ধ্বজাধারী পুরোহিত আলেম শ্রেণি থেকে। রসুলের বিরোধীতাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু জহল যার উপাধী ছিল আবুল হাকাম অর্থাৎ জ্ঞানীদের পিতা। আমাদের বর্তমান আলেমরাও নিজেদের বড় আলেম ও মহাজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য নামের আগে আল্লামা (মহাজ্ঞানী, Very high scholar) ট্যাগ লাগান। কিন্তু যে পবিত্র মানুষগুলো স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে ইসলামের আকিদা শিক্ষা করেছেন তাদের নামের আগে এমন কোন বিশেষণ কেউ ইতিহাসের উপর চিরুণী অভিযান চালালেও দেখাতে পারবে না। খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ বলেছেন, "তারা তাদের ধর্মগুরু ও পাদ্রীদের তাদের রব (প্রভু) বানিয়ে নিয়েছে (তওবা-৩১)।" সুতরাং সর্বযুগেই সকল ধর্মের পুরোহিতরাই আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ধর্মকে আড়ালে রেখে নিজেদের মনগড়া কথাকে ধর্ম হিসেবে চালিয়েছে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেরাই মানুষদের রব বা মওলা সেজে বসে রয়েছে। বর্তমান বিকৃত ইসলামের ধর্মব্যবসায়ী আলেমরাও একই কাজ করে যাচ্ছে। তারা ধর্মের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে না এনে ধর্মকে নিজেদের ফায়দার জন্য ব্যবহার করছে। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন, "তাদের মধ্যে এমন একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণের মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যেন তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর থেকে আগত অথচ এসব আল্লাহর থেকে প্রেরিত নয় (সুরা ইমরান ৭৮)। আল্লাহ কত সুন্দর ভাবে তাদের স্বরূপ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ এছাড়াও কোর'আনের আরো অনেক জায়গায় এই ধর্মজীবী মোল্লাশ্রেণীর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ধর্মজীবী মোল্লারা আল্লাহর বিধানকে গোপন করে, আল্লাহর দীন বিক্রি করে ও দীনের অতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতভেদ সৃষ্টি করে ও জাতির ঐক্য ধ্বংস করে। এছাড়াও তারা সমাজের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন, "দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদের পাপ কথা ও হারাম ভক্ষণে নিষেধ করেন না? বরং তারা যা করে তাও অতি নিকৃষ্ট (সুরা মায়েদা ৬৩)।

আল্লাহর অমূল্য আসমানী কিতাবকে যারা এভাবে আয়ত্ত্ব করে দীনকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছেন তাদেরকে আল্লাহ তুলনা করেছের কিতাব বহনকারী গর্দভের সাথে (সুরা জুম'আ ৫)। অনেক ধর্মজীবী আলেম আল্লাহর এ সকল দ্ব্যর্থহীন আয়াতের থেকে আত্মরক্ষার জন্য খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যে এ সকল আয়াতগুলো শুধুমাত্র ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আলেমদের জন্য দেয়া হয়েছে আমাদের জন্য নয়। কিন্তু কোর'আনে আল্লাহ পূর্ববর্তী ধর্মগুলির প্রসঙ্গ টেনেই এনেছেন আমাদের উদাহরণ পেশ করার জন্য যাতে আল্লাহর দীন ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত না হয়। কারণ আল্লাহর প্রেরিত এ শেষ দীন কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বা নির্দিষ্ট জায়গার জন্য প্রেরিত হয় নি এই দীন সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাই এ শেষ দীন যদি বিকৃত হয়, যদি দুর্বোধ্য হয়ে যায় তবে মানবজাতি মহা সংকটে পড়বে যেমনটি বর্তমানে হয়েছে।

কোরআনের বহু আয়াতে বজ্রকঠিন হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীর দুনিয়ালোভী আলেমগণ নামাজ পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, জানাজা পড়িয়ে, ওয়াজ মাহফিল করে, এক কথায় ধর্মেজীবীতার মাধ্যমে টাকা রোজগার করছে। তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো হালাল কে হারাম ও হারাম কে হালাল হিসেবে ফতোয়া দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করছে। আল্লাহর রসুল যে শেষ দীন নিয়ে এসেছিলেন সে দীনে এমন ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির কোন স্থান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সেই দীনের কর্তৃপক্ষ (অঁঃযড়ৎরঃু) হয়ে বসে আছে আলাদা পুরোহিত শ্রেণি। তারা নিজেদের নবীর উত্তরাধিকারী, ওরাসাতুল আম্বিয়া (Spiritual Successor) হিসেবে দাবি করে। কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন, "তাদের পিছনে এসছে কিছু অপদার্থ যারা উত্তারধিকারী হয়েছে কিতাবের, তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত এর অনরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আবার যদি উপস্থিত করা হয় তবে তাও তারা গ্রহণ করবে। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট থেকে নেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না (সুরা আরাফ ১৬৯)।

সুতরাং তারা জেনে শুনে হারাম গ্রহণ করছে ও মানুষের কাছে তা গোপন করছে। অন্যদিকে তারাই বলছে যে ইবাদত ও দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল উপার্জন। আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বীত হন যখন কেউ অন্যকে সে উপদেশ দান করে যা সে নিজে করে না। কিন্তু এ ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী আল্লাহর ক্রোধকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে এই নিকৃষ্ট কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি যে ভয়বাহ শাস্তির কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন তার প্রতিও তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

দুর্বলতম মানুষটির জন্যও যিনি বিচলিত হন!

মোহাম্মদ আসাদ আলী

রসুলাল্লাহর মক্কা জীবনের একটি ঘটনা। একদিন তিনি কোরাইশ গণ্যমান্য নেতাদের নিয়ে বসেছেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন তারা রসুলাল্লাহর কথাগুলো মনোযোগের সাথে শুনছিল এবং মাঝে মাঝেই 'ঠিকই তো' 'কথা তো সত্য' এরকম মন্তব্য করছিল। তাদের এমন ইতিবাচক সাড়া দেখে রসুলাল্লাহ আশাবাদী হয়ে উঠলেন। বলা তো যায় না, হয়ত এই মোশরেক গোত্রপতিদের ভাবান্তর হচ্ছে, সন্দেহের মেঘ কেটে গিয়ে সত্যের সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ছে তাদের অন্তকরণে। তাই কিছুটা আশান্বিত হৃদয়ে রসুল (সা.) কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময়ে হঠাৎ সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মি মাকতূম (রা.) নামক এক অন্ধ সাহাবী উপস্থিত হলেন।

এই সাহাবীর ব্যাপারে বলে রাখি যে, তিনি বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, প্রায়ই তিনি রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে হাজির হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথাবার্তা শুনতেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। সেদিনও তিনি রসুলকে (সা.) প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলেন। ইবনে উম্মি মাকতুমের (রা.) এই আগমনে ও পরিস্থিতি না বুঝে বাক্যালাপ শুরু করায় আল্লাহর রসুল একটু বিরক্ত হলেন এবং বিরক্তিসূচক তাঁর কিছুটা 'ভ্রুকুঞ্চিত' হলো। তবে বিরক্ত হলেও তিনি ইবনে উম্মি মাকতুমকে (রা.) চলে যেতে বললেন না কিংবা 'আমি এখন কোরাইশ নেতাদের সাথে কথা বলছি, এর মাঝে কথা বল না' এমন কোনো মন্তব্যও করলেন না।

ঘটনাটি একদিক থেকে দেখলে খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সেজন্যই ইবনে উম্মি মাকতুম (রা.) এর প্রতি রসুলের 'ভ্রুকুঞ্চন' সবার অগোচরেই থেকে গেল। কিন্তু যাঁর কাছে একজন মো'মেনের সম্মান তাঁর ক্বাবারও ঊর্ধ্বে, সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই ঘটনা দেখলেন এবং এই সামান্য 'ভ্রুকুঞ্চনটুকুও' তিনি বরদাস্ত করলেন না। পরোক্ষণেই সুরা আবাসা নাজেল করে আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কাছে ঐ অন্ধ ব্যক্তির মর্যাদা ঐসব অহংকারী কোরাইশ গোত্রপতিদের চাইতে অনেক অনেক বেশি। আল্লাহ তাঁর রসুলের (সা.) ঐ ভ্রুকুঞ্চনকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "তিনি (রসুল) ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত? পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবানী। অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে।" (সুরা আবাসা ১-১২)

এই আয়াতগুলো যখন পড়ি তখন নিজের অজান্তেই চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে আসে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজাধিরাজ, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ, কোনো কিছু সৃষ্টি ও ধ্বংসের জন্য যার একটি হুকুমই যথেষ্ট, তিনি ভর্ৎসনা করছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে এবং তা কেবল এই জন্য যে, তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন! বান্দার প্রতি কতটা সহানুভূতি থেকে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন! একজন মো'মেন বান্দার জন্য কতটা মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা মিশে আছে এই কয়টি শব্দের মধ্যে!

সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তো জানতেন আল্লাহর রসুল কেন ইবনে উম্মি মাকতুমের (রা.) কথায় কর্ণপাত করেন নি, কেন 'ভ্রুকুঞ্চন' করেছিলেন। সময়টি খেয়াল করুন, মক্কায় তখন রসুলের (সা.) বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত অপপ্রচার চলছে। চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে প্রবল বিরোধিতা, মারধর, নির্যাতন, হুমকি-ধমকি। হাতে গোনা কয়েকজন অনুসারী হয়েছে, তাদেরকেও ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য কতই না জোরাজুরি চলছে। কোরাইশ নেতারা, সমাজপতিরা, পুরোহিতরা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যে কোনো উপায়ে তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর। এমতাবস্থায় একটি আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য একজন দক্ষ সংগঠকের যে উদ্যোগটি নেওয়া উচিত আল্লাহর রসুলও তাই নিলেন। তিনি সমাজের বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদেরকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন তিনি কী চান, কী লক্ষ্যে তাঁর এই আন্দোলন। উদ্দেশ্য বেশিকিছু নয়, অন্তত যেন তাঁর প্রতি কোরাইশ নেতাদের বিদ্বেষভাবটা দূর

হয়ে যায়, অপপ্রচার বন্ধ হয় এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীরা আর নির্যাতনের শিকার না হয়। যেদিনকার ঘটনা বললাম সেদিনের আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে আল্লাহর রসুলকে না জানি কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, কতবার সুযোগ এসেও আসে নি, হয়ত তাঁর কথায় কেউ মনোযোগীই হয় নি। এতকিছুর পর যখন তিনি বলার মত উপযুক্ত একটি পরিবেশ পেলেন এবং তাঁর বক্তব্যে কোরাইশ নেতাদেরকে মনোযোগী হতে দেখা গেল ঠিক সেই সময়ে ইবনে উম্মি মাকতুম (রা.) উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং তার ফলে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুযোগ ভেস্তে যাবার আশঙ্কাতেই রসুল ভ্রুকুঞ্চন করলেন। এতে রিপুজয়ী মহানবীর ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভ ছিল না তা তো মহান আল্লাহর অজানা নয়। কিন্তু ঐটুকুও তিনি বরদাস্ত না করে প্রিয় হাবিবকে ভর্ৎসনা করতে ছাড়লেন না এবং পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিলেন, এরপর যেন আল্লাহর রসুল এমন কাজ আর না করেন। ইতিহাসে পাই আল্লাহর রসুল তো রসুলই, তাঁর আসহাবদের মধ্যেও প্রত্যেকে উম্মি মাকতুমকে (রা.) আজীবন মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন। সুরা আবাসার উপরোক্ত আয়াতগুলো নাজেলের পর থেকে আল্লাহর রসুল ইবনে উম্মি মাকতুমকে (রা.) প্রচণ্ড শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাকে আসতে দেখলে বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তাঁর খোঁজ-খবর রাখতেন। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনতেন। দেখা-সাক্ষাৎ হলে জানতে চাইতেন তাঁর কোনোকিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, কোনো কথা বলবেন কিনা। যখন মদীনার বাইরে যেতেন, তখন ইবনে উম্মি মাখদুমকে (রা.) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যেতেন। রসুলের শত শত সাহাবী রসুলের অনুপস্থিতিতে উম্মে মাখদুমের (রা.) পেছনে সালাহ কায়েম করতেন।

এই আয়াত নাজেলের পর চিরদিনের জন্য একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, সমাজের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, অর্থবিত্তের অধিকারী রুই-কাতলাদের চাইতে সত্যনিষ্ঠ একজন ইবনে উম্মি মাকতুম (রা.) আল্লাহর কাছে বেশি ভালোবাসার পাত্র, বেশি মর্যাদার অধিকারী। এবং এই সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলো বংশগৌরবে, শারীরিক সক্ষমতায়, আর্থিক মাপকাঠিতে যেমনই হোক, তাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চন করার অধিকার কোনো বনি আদমের তো বটেই, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরও নেই। এই হচ্ছেন আমার আল্লাহ, যিনি সমাজের সবচাইতে দুর্বল মানুষটির জন্যও বিচলিত হন। এজন্যই আমার আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে আমি গর্বিত হই, আমার আল্লাহর হুকুম মান্য করে ধন্য হই। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে এজন্যই আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ঘোষণা করি- 'আল্লাহু আকবার' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

মানব কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য

সমাজে শান্তি স্থাপনের নামই ইসলাম।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন, আমাদের ফেইসবুক পেজে–

/SYSTEMPALTAI

সরাসরি স্ক্যান করে ভিজিট করুন

মাহফিলের উপজীব্য যখন অপপ্রচার

রিয়াদুল হাসান

ওয়াজের জন্য সুবিধাজনক সময় শীতকাল। বৃষ্টি-বাদলা হয় না। এসব ওয়াজে আমাদের দেশের ওয়াজকারীরা বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনী বলে থাকেন, নবী প্রেমের কাহিনী বলে থাকেন। আর যেটা করেন তাহলো ভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদের, পীরদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা করে থাকেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাদের পকেট থেকে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ বের করে ওয়াজের আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষের হাত পযন্ত পৌঁছে দেওয়া। যে ওয়াজকারী শ্রোতার মধ্যে বেশি আবেগ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন অর্থের বিচারে তার মূল্যায়নও বেশি হয়। উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য তারা আমাদের দেশে সাধারণত হিন্দুদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে, ভগবান-অবতারদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে থাকেন। কখনও কখনও যদি দেশে কাদিয়ানী বা ইসলামবিদ্বেষীদের ইস্যু জুটে যায় তখন ঐ ইসলামবিদ্বেষীদের নাস্তিক, মুরতাদ ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে গা গরম করা ওয়াজ পরিবেশন করেন।

হেযবুত তওহীদ এখন এদেশে ইসলামের কথা বলার একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এবং দেশের লক্ষ কোটি মানুষ এই আন্দোলন সম্পর্কে বাইশ বছরের অপপ্রচার থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক পথ, সঠিক ইসলামের সন্ধান পাচ্ছে। হেযবুত তওহীদের এই গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির বিষয়টি ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যাপক অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেছে। তারা এই শীতের মৌসুমে উঠে পড়ে লেগেছেন তাদের ভাষায় হেযবুত তওহীদের 'গোমর ফাঁস' আর 'মুখোস উন্মোচন' করার জন্য। বহু জেলায় মাহফিলগুলোতে এখন ওয়াজের বিষয়বস্তু মুসলমানদের দুর্গতি না, সমাজের অন্যায় অশান্তি না, দুনিয়াজোড়া মুসলমানেরা যে মার খাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কী করণীয় এসব কিচ্ছু না, বিষয়বস্তু হলো হেযবুত তওহীদ। হেযবুত তওহীদ নিয়েই তাদের যত মাথাব্যথা, জনগণকে উসকে দিয়ে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের বাড়িঘরে হামলা করতে হবে, তাদেরকে হত্যা করতে হবে, জবাই করতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে, এই হচ্ছে তাদের ওয়াজ।

প্রশ্ন করতে পারেন, আপনাদের বিরুদ্ধে তাদের এই ক্ষোভ কেন? বস্তুত এর কারণ খুব সোজা।

- আমরা বলি যে, আমাদের সমাজের ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি যে ইসলামটাকে বিক্রি করে খাচ্ছেন সেটা আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়। সেটা বিগত তেরশ বছরে বিকৃত হতে হতে এখন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি হয়ে গেছে।
- আমরা বলি যে, তারা যে ধর্মীয় কাজের বিনিময় নিচ্ছেন এই কাজটি আল্লাহ হারাম করেছেন।
- হেযবুত তওহীদ ইসলামের কথা বলবে এটা তাদের অহঙ্কারের উপর বিরাট আঘাত। তারা এই সমাজে ইসলামের কর্তৃপক্ষ বলে স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত। তারা নিজেরাও বিশ্বাস করেন যে, তারাই ইসলামের প্রতিভূ। তারা মাদ্রাসায় পড়ে এত সময় ব্যয় করেছেন, এত কেতাব মুখস্থ করেছেন। সেখানে তারা ছাড়া আর কেউ ইসলামের কথা কেন বলবে?

জাতির ধর্মীয় নেতাদের এই যে বাণিজ্যিক মনোভাব, স্বার্থপরতা এটাই হচ্ছে এ জাতির গত কয়েকশ বছরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারার মূল কারণ। আলেমদের পথভ্রষ্টতা, দোষাদোষী, এক ফেরকার বিরুদ্ধে আরেক ফেরকার রেষারেষি, ক্ষুদ্রচিন্তা, ইসলামকে মাসলা-মাসায়েলের মধ্যে বন্দী করা ইত্যাদি এ জাতিটাকে বৃহৎ চিন্তা করতে দিচ্ছে না। ইসলামবিদ্বেষীরা যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে লেগেছে এরাও তেমনি একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে লেগেছে। হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ইসলামবিদ্বেষীরা ব্যবহার করছে তাদের গণমাধ্যম, তারা টেবিলে বসে তৈরি করছ মিথ্যা সংবাদ আর এই ধর্মজীবীরা করছেন ওয়াজ। তবে আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, সত্য যখন একবার প্রকাশ পেয়েছে এই সত্যের পথকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

শিল্পচর্চা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ধর্ম

রিয়াদুল হাসান

একটা মহাসত্য আমাদের এই ষোল কোটি বাঙালিকে আজ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে; সেটা হলো আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ এক ঘোরতর সংকটে নিমজ্জিত। আমাদের জাতির অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মবিশ্বাস মানুষের একটি মূল্যবান সম্পদ যা যুগে যুগে মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে অটল রেখেছে, ভোগবাদী জীবনের পরিবর্তে মানবকল্যাণকামী করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের সেই অমূল্য সম্পদ ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমানকে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বার বার ভুলপথে প্রবাহিত করে একাধারে ধর্মকে কালিমালিপ্ত করছে ও জাতির অকল্যাণ সাধন করছে। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরলপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির আশায় বিভিন্ন ধরণের নৈরাজ্য সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়ে পরছে। এতে না ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে, না জাতি উপকৃত হয়েছে, এর দ্বারা ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো ইহকাল ও পরকাল-উভয়জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক সব কর্মকাণ্ডের কারণে দুর্নাম হচ্ছে ধর্মের। এক শ্রেণির মানুষ ধর্মের নামে এসব অন্ধত্ব দেখে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছেন, তারা ধর্মকেই অচল, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন। আমরা বলতে চাই আমাদের ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান আমাদের একটা শক্তিশালী চেতনা, জাতীয় সম্পদ; আমরা এই শক্তিতে বলীয়ান। এই ঈমানকে দেশ জাতি এবং সমাজের কল্যাণে, জাতির ঐক্য উন্নতি প্রগতিতে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব। আজ ধর্ম ও এবাদতের অর্থকে কেবল উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখায় এ থেকে ধর্মব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও জাতি কিছুই পাচ্ছে না। মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। তার কেবল জাগতিক জীবন নয়, একটি পরকালীন জীবনও আছে। কাজেই সকল ধর্মই মানুষের উভয় জগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই এসেছে, কেবল দুনিয়া বা কেবল পরকালের জন্য নয়। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, রাত জেগে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করা, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি মানুষ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, নির্ভয়ে চলাচল করতে পারে, দুষ্কৃতকারীরা ধ্বংসাত্মক কাজ না করতে পারে সে লক্ষ্যে রাত জেগে পাহারা দেওয়াও বড় সওয়াবের কাজ। এক কথায় মানুষকে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তার মধ্যে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই মানুষের প্রকৃত এবাদত। এই এবাদত করলেই সে পরকালে জান্নাত পাবে। কিন্তু জাতীয়-সামাজিক উন্নয়নের কাজকে আজ ধর্মীয় কাজ বলে কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না, ধর্মের এ দিকটিকে ঢেকে ফেলা হয়েছে। কারণ এই সমস্ত কাজে ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের কোনো লাভ হয় না। ধর্মের কোনো বাস্তবমুখী, জীবনমুখী চর্চা আমাদের সমাজে নেই, আছে কেবল সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিক পরকালমুখিতা, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ। জাতির ঐক্য নষ্ট করা যে কুফর তা শেখানো হয় না, ষোল কোটি মানুষের অধিকাংশই ধর্মবিশ্বাসী হলেও সর্বত্র চলে অনৈক্যের শিক্ষা, অপরের বিষোদগার ও ষড়যন্ত্র করে জয়ী হওয়াই যেন এক শ্রেণির রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য। আজ কেবল মসজিদে, মাদ্রাসায় দানকেই বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় দান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে রাস্তায় মানুষ চলাচল করে সেই রাস্তা নির্মাণের জন্য দান করাও যে আল্লাহর রাস্তায় দানের অন্তর্ভুক্ত- এই শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই শিক্ষা না থাকায় কেউই জাতীয় উন্নয়নের কাজে অংশ নেওয়াকে এবাদত বলে মনে করছেন না। আজ যদি ধর্মের প্রকৃত

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। তার কেবল জাগতিক জীবন নয়, একটি পরকালীন জীবনও আছে। কাজেই সকল ধর্মই মানুষের উভয় জগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই এসেছে, কেবল দুনিয়া বা কেবল পরকালের জন্য নয়। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, রাত জেগে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করা, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি মানুষ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, নির্ভয়ে চলাচল করতে পারে, দুষ্কৃতকারীরা ধ্বংসাত্মক কাজ না করতে পারে সে লক্ষ্যে রাত জেগে পাহারা দেওয়াও বড় সওয়াবের কাজ।

উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে আমাদের দেশে যে সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহ দান করেছেন, তা দিয়েই আমরা উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারব। ধর্মবিশ্বাসের মতো এত বড় সম্পদ আজ পচে গলে নষ্ট হচ্ছে। কাজেই ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানকে অবজ্ঞা করা নয়, খাটো করা নয়, জাতির উন্নয়নে লাগাতে হবে। ধর্মব্যবসায়ীদের অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও, কারণ তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। তারা কেবল একটি নির্দিষ্ট পোশাক, আচার আচরণ, নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিকেই অন্য জাতিগোষ্ঠীর উপরে 'ধর্মীয় সংস্কৃতি' বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। অথচ প্রতিটি জাতির মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির পেছনে ধর্মের অবদানই মুখ্য। এটা উপলব্ধি না করে তারা একচেটিয়াভাবে চিত্রাঙ্কন, সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চাকে না-জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়ে মানবজাতির প্রগতির পথ, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সুকুমার বৃত্তি যা মানুষের ইতিবাচক মানসিক বিকাশ সাধন করে, মানুষকে আনন্দিত করে, তাকে সৃষ্টিশীল হতে, মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে তা কোনো ধর্মেই নিষিদ্ধ নয়। ধর্মের চিরন্তন উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি। যা কিছু মানুষের জাগতিক শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেটাই ধর্মে নিষিদ্ধ, এর বাইরে একটি জিনিসও নিষিদ্ধ নয়। যে কোনো অশ্লীলতার বিস্তার সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে এটা সমাজবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাই কোনো প্রকার অশ্লীলতাকেই ধর্ম বৈধতা দেয় না, সেটা চলচ্চিত্রেই হোক বা পোশাকেই হোক বা সাহিত্যেই হোক। এখন পশ্চিমা অশ্লীল সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পাঙ্গনেও অশ্লীলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তরুণ সমাজ এর দ্বারা নৈতিক অবক্ষয়ের স্বীকার হচ্ছে।

ধর্মব্যবসায়ীদের অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও, কারণ তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সকল প্রকার শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। তারা কেবল একটি নির্দিষ্ট পোশাক, আচার আচরণ, নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিকেই অন্য জাতিগোষ্ঠীর উপরে 'ধর্মীয় সংস্কৃতি' বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। অথচ প্রতিটি জাতির মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির পেছনে ধর্মের অবদানই মুখ্য। এটা উপলব্ধি না করে তারা একচেটিয়াভাবে চিত্রাঙ্কন, সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চাকে না-জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়ে মানবজাতির প্রগতির পথ, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করতে চাচ্ছে।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই সত্যটি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন শুদ্ধ সংস্কৃতির একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। উচ্চাঙ্গ সংগীতে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান ও দখল। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কীর্তিকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমী'র অন্যতম উদ্যোক্তা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন এমামুয্‌যামান। তরুণ বয়সে তিনি ছিলেন একজন শিকারী, ফুটবলার ও মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট। এছাড়াও তিনি ১৯৫৪ সনে রায়ফেল শ্যুটার হিসাবে অবিভক্ত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। আমাদের যুব সমাজকে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী করার জন্য এবং লুপ্তপ্রায় জাতীয় খেলা কাবাডিকে পুনর্জীবন দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তওহীদ কাবাডি দল'।

আমরা তাঁর অনুসারী হিসাবে বলতে চাই, আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রগতি, প্রগতির শিখরে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। অপরাজনীতি, অনাচার, অসহিষ্ণুতা, জঙ্গিবাদসহ যাবতীয় অপশক্তির কবল থেকে সমাজের মানুষকে মুক্ত করে ন্যায় সুবিচার শান্তির মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কাজ করা একাধারে আমাদের এবাদত ও সামাজিক কর্তব্য। একাত্তর সনে শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, এখনো তেমনিভাবে শিল্পীরা অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে যদি এই জাতিকে জাগানোর জন্য প্রচেষ্টা চালান সেটাও তাদের এবাদত হিসাবে গণ্য হবে। আমরা দেশের সকল সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী, সংস্কৃতিমনা ও ক্রীড়ামোদী মানুষকে আহ্বান করছি- আসুন, আমরা যার যার অবস্থান থেকে শতধাবিভক্ত এই জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ভূমিকা রাখি।

(লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি)

ইতিহাসের পাতা থেকে

কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে ইসলামের আদর্শ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধগুলো কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে বিস্তার লাভ করছিল, জাহেলিয়াতের প্রভাব পুরোটা কাটে নি, তখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব থেকে চলে আসা বিভিন্ন রকমের সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবে আভিজাত্য ও কৌলীন্য প্রথা বিদ্যামান ছিল। কিন্তু মহানবী (দ.) এর আগমনের পর এ প্রথার অবসান ঘটে। কারণ আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে স্পষ্ট বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী (সুরা হুজরাত ১৩)।" কিন্তু প্রথম দিকে আরবের অনেকেই তাদের গোত্রীয় আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে ইসলামের সাম্যের মানদণ্ড গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

প্রাচীন গাসসান গোত্রের গোত্রপতির ছেলে যারা নিজেদেরকে যুবরাজই মনে করতেন, জাবালা ইবন আল আইহাম ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় হজ্জ করতে আসেন। হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের সময় একজন অখ্যাতনামা বেদুঈন ভিড়ের মধ্যে তাঁর কাপড়ের প্রান্ত মাড়িয়ে দেয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জাবালা লোকটার গালে চপেটাঘাত করেন। এর ফলে লোকটি ওমরের (রা.) নিকট বিচারের দাবি করলেন। অভিযোগের উত্তরে ওমর (রা.) জাবালাকে বললেন, তিনি ক্ষমা চাইলে সেই বেদুঈন হয়তো তাকে ক্ষমা করে দিবেন নয়তো তিনি বেদুঈনকে জাবালার গালে অনুরূপ চড় মারার অনুমতি দিবেন। জাবালা এমন কঠোর সাম্যনীতির অনুশাসন এড়াবার জন্য নিজের দেশে পালিয়ে যান এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে শুধু একজন দলপতি হিসেবে তার মর্যাদা পূর্বের চেয়ে বেড়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখলেন ভিন্ন চিত্র।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের (রা.) শাসনামলের এই ঘটনাটি থেকে একদিকে সাম্যের পতাকাবাহী খলিফার নিষ্ঠা অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীদের গোত্রীয় সংস্কারের প্রতি অনমনীয় মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দামেশক বিজয়ের পর আবু ওবায়দাহ (রা.) যখন হেমসের দিকে অগ্রসর হলেন তখন দামেশকের উত্তর দিকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত 'বালা বাক্কা' এর সন্নিকটে এ ঘটনার বর্ণনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহ একটি চিঠি খলিফা ওমর (রা.) থেকে তাঁর হস্তগত হয়। চিঠিটি খুরশীদ আহমদ ফারিক এর 'ওমর (রা.)- এর সরকারী পত্রাবলি' গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হলো।

"কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। আর মোহাম্মদ (সা.) তাঁর রসুল"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন এর পক্ষ হতে আমীনুল উম্মত [রসুলাল্লাহ (সা.) প্রদত্ত আবু ওবায়দাহ (রা.)-এর সম্মানসূচক পদবী] - এর প্রতি; সালমুন আলাইকা। আমি সেই প্রভুর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। আর তাঁর নবী মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ ও সালাম। আল্লাহর হুকুম এবং ইচ্ছাকে পরিবর্তন করতে পারবে না কেউই। লওহে মাহফুজে যার সম্পর্কে কাফির বলে লিখে দেওয়া হয়েছে তার ঈমান নসীব হতে পারে না কখনও। আপনার অবগতির জন্য লিখেছি যে, জাবালা ইবন আয়হাম গাস্সানী তার চাচাত ভাই ও স্বগোত্রীয় নেতৃবর্গসহ আমাদের কাছে (মদীনায়) এসেছিল। আমি তাদের অভ্যর্থনা করেছি। সবাই আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের

ইসলাম গ্রহণে আমি আনন্দিত হয়েছি। কেননা তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। কিন্তু অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে যা লুক্কায়িত ছিল তা আমার জানা ছিল না। আমরা হজের জন্য মদীনা হতে মক্কায় গেলাম। জাবালাহ সাতদিন পর্যন্ত বায়তুল হারামে তাওয়াফ করল। তাওয়াফকালে এক ফাযারী আরবের পায়ের নিজে তার চাদর পড়ে যাওয়ায় তা কাঁধ থেকে খসে পড়ে। জাবালাহ রাগত চোখে ফাযারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল যে, "তোর অকল্যাণ হউক। তুই আল্লাহর ঘরের সামনে আমায় উলংগ করে দিলি।"

প্রতি উত্তরে ফাযারী বলল, "আল্লাহর কসম, আমি ইচ্ছা করে এরূপ করি নি।"

এতদসত্ত্বেও জাবালাহ তাকে এমন জোরে চপেটাঘাত করে বসল যে, এতে তার নাক যখমী হয়ে গেল এবং তার সম্মুখের দাঁত চারটি ভেঙে গেল। ফাযারী আমার কাছে ফরিয়াদ নিয়ে আসল। আমি জাবালাহকে ডাকলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তোমার ফাযারী ভাইকে থাপ্পড় মারলে কেন এবং তার দাঁত চারটি কেন ভেঙে দিলে? তা ছাড়া তার নাকে জখমই বা করলে কেন?"

জাবালাহ বলল, "সে পায়ের নিচে আমার চাদর ফেলে আমায় উলঙ্গ করে দিয়েছে তাই। আল্লাহর কসম, যদি বায়তুল্লাহর সম্মানের খেয়াল না হতো তাহলে ওকে আমি মেরেই ফেলতাম।"

আমি বললাম "তুমি অন্যায় করেছ, এখন হয়তো সে তোমায় মাফ করে দেবে। না হয় আমি তোমার থেকে এর বদলা গ্রহণ করবো।"

জাবালা বলল, "আমার থেকে কেসাস গ্রহণ করা হবে? অথচ আমি একজন বাদশাহ, আর সে একজন সাধারণ আরব নাগরিক।"

উল্লেখ্য, এখানে কেসাস বলতে ফাযারী কর্তৃক একই প্রকার একটি চপেটাঘাত জাবালাকে প্রদান করা বোঝানো হয়েছিল।

আমি বললাম, "তোমরা উভয়েই মুসলমান। তুমি কেবল উত্তম চরিত্র বলেই তার উপর প্রাধান্য পেতে পার।"

জাবালাহ আমার কাছে পরের দিন পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করল। আমি এ ব্যাপারে ফাযারীকে জিজ্ঞেস করলে, সে রাজী হয়ে গেল। যখন রাত্র হলো, জাবালাহ তার চাচাত ভাইদের সহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে সিরিয়ার দিকে পলায়ন করে 'কালবুত তাগিয়াহ' (অবাধ্য কুকুর রোমসম্রাট) এর কাছে গিয়ে উঠল। আমার আশা, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবে সে আপনাদের হাতে পড়বে।

হেমস বিজয়ের পর যাত্রা স্থগিত রাখবেন। সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। যদি হেমসবাসীরা সন্ধি করে তবে তো উত্তম। অন্যাথায় তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবেন। আর কায়সারে রোমে হেড কোয়ার্টারে নিজেদের গুপ্তচর নিয়োগ করবেন এবং সিরিয়ায় অবস্থানরত আরবীয় (খ্রিস্টান)-দের সম্পর্কে সব সময় হুঁশিয়ার থাকবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার ও সমগ্র মুসলমানদের উপর বর্ষিত হউক।"

আজ দুনিয়াময় মুসলিম বলে যে জাতিটি পরিচিত সেটা বহু ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ ফেরকা-মাযহাব বিশ্বাস করে যে সেই ভাগটাই শুধু প্রকৃত ইসলামে আছে, বাকি সব মাযহাব, ফেরকা পথভ্রষ্ট, ঠিক যেমন অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নিশ্চিত যে তাদের ধর্মই সঠিক, অন্য সব ধর্মের মানুষ নরকে যাবে।

ভিজিট করুন
WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

একটিমাত্র ফেরকা বাদে সমস্ত ফেরকা-মাযহাব আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে

মাননীয় এমামুয্যামানের লেখা থেকে

আল্লাহর রসুল (সা.) একদিন মরুভূমির বুকে একটি সরল-সোজা লাইন থেকে ডান দিকে কতকগুলি এবং বাম দিকে কতকগুলি লাইন টানলেন এবং বললেন- শয়তান এই রাস্তাগুলিতে ডাকতে থাকবে। এই বলে তিনি কোর'আন থেকে এই আয়াত পড়লেন- নিশ্চয়ই এই হচ্ছে আমার (আল্লাহর) সহজ-সরল পথ সেরাতুল মোস্তাকীম। সুতরাং এই পথেই চলো, অন্য পথে চলো না, (অন্যপথে) চললে তা তোমাদের তার (আল্লাহর) পথ থেকে (চতুর্দিকে) বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এইভাবে তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা সাবধানে পথ চলতে পার (সুরা আল-আনাম ১৫৪ এবং হাদিস- আব্দাল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে- আহমদ, নিসায়ী, মেশকাত)।

আল্লাহ ও তার রসুলের (সা.) সরাসরি আদেশকে অমান্য করে সেরাতুল মোস্তাকীমকে ত্যাগ করে এই জাতি আজ অতি মুসলিম হয়ে শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ দুনিয়াময় মুসলিম বলে যে জাতিটি পরিচিত সেটা বহু ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ ফেরকা-মাযহাব বিশ্বাস করে যে সেই ভাগটাই শুধু প্রকৃত ইসলামে আছে, বাকি সব মাযহাব, ফেরকা পথভ্রষ্ট, ঠিক যেমন অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নিশ্চিত যে তাদের ধর্মই সঠিক, অন্য সব ধর্মের মানুষ নরকে যাবে। কিন্তু আসলে অন্যান্য সব ধর্ম যেমন তাদের নবীদের (সা.) দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, মুসলিম নামধারী এই জাতিও তার নবীর (সা.) প্রতিষ্ঠিত পথ থেকে তেমনি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে যতখানি পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি আসলে, পূর্বে আল্লাহ নতুন নবী পাঠিয়েছেন, এই জাতিতে ততখানি বিকৃতি বহু পূর্বেই এসে গেছে। নতুন নবী আসেন নি কারণ, নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ রসুলের (সা.) প্রতিষ্ঠিত পথে, প্রকৃত ইসলামে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য অবিকৃত কোর'আন ও রসুলের হাদিস আছে যা অন্যান্য ধর্মে নেই।

ইসলাম ধর্মের বিভক্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাগ হচ্ছে শিয়া মাযহাব। এই মাযহাবের পণ্ডিতরাও কোর'আন-হাদিসের চুলচেরা বিশ্লেষণে সুন্নী পণ্ডিতদের চেয়ে পেছনে পড়ে নেই এবং তাদের পাণ্ডিত্যের ফলে শিয়া মাযহাবও অগণিত ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে সুন্নীদের মত। ফলে প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্য থেকে শিয়া-সুন্নী উভয় মাযহাবই বহু দূরে। কে বেশি দূরে কে কম দূরে এ পরিমাপ করা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়, আমাদের সাধ্যও নয়, আমরা শুধু এইটুকুই জানি যে মহানবীর (সা.) কথিত একটিমাত্র ফেরকা বাদে শিয়া-সুন্নীসহ আর সমস্ত ফেরকা, মাযহাব আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, অর্থাৎ তারা মহানবীর (সা.) ইসলামে নেই। সেই একমাত্র ফেরকা কোন্ ফেরকা তা একটু আগেই বলেছি।

সুন্নীরা যেমন বিশ্বনবীর (সা.) প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ করে আল্লাহ-রসুলের নিষিদ্ধ 'চুলচেরা বিশ্লেষণ' করে উম্মাহকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিলেন এবং হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে খানকায়, হুজরায় ঢুকে উম্মাহর বর্হিমুখী (Extrovert) গতিকে অন্তর্মুখী করে একে স্থবির করে দিলেন (Introvert), তেমনি শিয়ারাও তাদের মাযহাবকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বহু ভাগে ভাগ করে দিলেন এবং নবীর (সা.) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাদ দিয়ে বহু পূর্বের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে নিয়ে মাতম করাটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-কর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে লাগলেন। মাতম করা কোন জীবন্ত জাতির মুখ্য কাজ হতে পারে না, মৃত জাতির হতে পারে।

[সম্পাদনা: রিয়াদুল হাসান, সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ]।